নবযুগের কথা

আশ্বিন, ১৩২৬

প্রবর্ত্তক পাব্‌লিশিং হাউস

চন্দননগর

মূল্য বারো আনা

চন্দননগর, বোড়াইচণ্ডিতলা
প্রবর্ত্তক পাব্‌লিশিং হাউস হইতে
শ্রীরামেশ্বর দে
কর্ত্তৃক প্রকাশিত
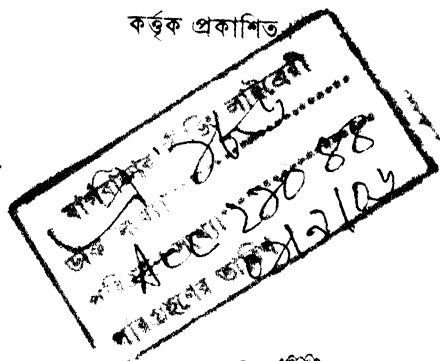
সূচী

নবযুগের কথা

মুখপত্র

আমাদের এ দেশটা এ জাতিটা অত্যন্ত প্রাচীন। এত প্রাচীন যে আমরা ইহার আদি ইতিহাস বিস্মৃত। আমরা রাম লক্ষণকে জানি, ভীষ্ম দ্রোণকে চিনি কিন্তু তাঁহাদের সময়ের তালিকা করিয়া উঠিতে পারি নাই। কত হাজার হাজার বৎসর যে এ জাতি বাঁচিয়া আছে তাহার ঠিকানা নাই। যে-জাতিটা এত হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে সে-জাতির জীবনে যে সময়ে সময়ে একটা করিয়া অবসাদের পালা আসিবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। তাই আমরা সমুদ্রের তরঙ্গের মত কখনও উঠিয়াছি কখনও পড়িয়াছি। যখন আমাদের মধ্যে প্রাণশক্তি জাগিয়াছে তখন আমাদের কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া হু হু শব্দে বাহির হইয়াছে ওজঃশক্তি—আর দিকে দিকে লোক ছুটিয়াছে আমাদের বার্ত্তা লইয়া—সে ঢেউয়ে জগৎ ভাসিয়া

গিয়াছে। সেই-সেই যুগে আমরা জ্ঞানে ও প্রেমে ভগবানকে ধরিয়াছি—গৌরবে এবং বৃহতে তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছি—বিরাট কর্ম্মে তাঁহার তুষ্টি সাধন করিয়াছি—মানব জীবনের পূর্ণ সার্থকতায় তাঁহাকে বড় করিয়া তুলিয়াছি। মানবমণ্ডলী সে খেলা দেখিয়াছে, বুঝিয়াছে, সম্ভ্রমে নতশিরে বলিয়াছে—ভারতবর্ষ তুমি ধন্য, তুমি পূজ্য। সভ্যতার আদি গুরু আমরা।

দিনের পর রাত্রি আসে। তাই আমাদেরও বিরাট কর্ম্মশীলতার পর পর একটা করিয়া অবসাদের যুগ আসিয়াছে। এই অবসাদের যুগে আর আমাদিগকে আমরা বলিয়া জানি নাই। তখন ভগবানের দানের অমর্য্যাদা করিয়াছি। যখন অন্তরে আনন্দ হারাইয়া বাহিরেও শুধু নিরানন্দকেই পাইয়াছি—তখন ভগবানকে বলিয়াছি—নিষ্ঠুর ভগবান, আমাকে তুমি সৃষ্টি করিলে কেন? তোমার জগতে আমার আনন্দ নাই, তোমার সৃষ্টিতে আমার আকাঙ্খা নাই, তোমার সার্থকতায় আমার তৃপ্তি নাই। আমি থাকিতে চাই না তোমার জগতে, আমাকে বিজন কান্তারে নির্জ্জন গিরিগুহায় লইয়া চল; যেখানে মানুষের মুখ দেখিতে হইবে না, আকাশের আলো সহ্য করিতে হইবে না—যেখানে পাখী গাহিবে না, ফুল হাসিবে না। আমাকে মুছিয়া ফেল তোমার ব্রহ্মাণ্ড হইতে—তোমার সৃষ্ট শব্দ গন্ধ রূপ রস আমি কিছুই চাহি না। ইহাই হইতেছে অবসাদের যুগ। ইহা মানুষের সত্যবস্তু নয়। এই কর্ম্মবিমুখতা, এই আনন্দহীনতা ইহা মানুষের অনৃতময়

স্বভাব। ইহার প্রতিষ্ঠা অজ্ঞানতায়। ইহার দেবতা অশুচি। ইহার ঋষি অবিশ্বাসী। ইহা মানবধর্ম্ম নয়।

কিন্তু দীর্ঘ শীতের রজনীরও অবসান হয়। তখন নবীন প্রাণের নূতন বার্ত্তা লইয়া নামিয়া আসে বসন্তের উষা। তাহার স্পর্শে বৃক্ষে বৃক্ষে প্রস্ফুটিত ফুলের সৌরভে গৌরবে পুষ্প-বাটিকা আহ্লাদে ভরিয়া যায়। বাতাসের সোহাগে সোহাগে বিটপীর কঙ্কাল সদৃশ শাখা-প্রশাখা পত্রে পত্রে ছাইয়া যায়। সাধ্য কি যে ফুল গাছেরা খুসী না হইয়া উঠে—ক্ষমতা কি যে বিটপীরা গৌরব বোধ না করে। এ যে ভগবানের স্পর্শ, ভগবানের দান।

তাই ঐ তমসাচ্ছন্ন অবসাদবিভাবরীর পরও এমন একটী উষা ফুটিয়া উঠে যে সেদিন বিশ্বের দিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে আচম্বিতে জীবন আহ্লাদে আহ্লাদে পূর্ণ হইয়া উঠে। মুখ আপনা-আপনি হাসিতে ভরিয়া যায়—বক্ষের স্তরে স্তরে আনন্দের স্পন্দন নৃত্য করিয়া উঠে—দেখি মানুষে আকাশে, আকাশে বাতাসে, বাতাসে ধরিত্রীতে এক অবিচ্ছেদ্য রহস্যময় সম্বন্ধ—দেখি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এক বিপুল আনন্দডোরে গাঁথা, সেখানে বিফল কিছুই নয়, নিরর্থক কিছুই নয়—আবেগ উচ্ছ্বাসে, গৌরবে সৌরভে জীবন ভরিয়া উঠে—আর গদগদ কণ্ঠে বলি ভগবান আমি ধন্য, তুমি ধন্য —তোমার জগৎ সংসার ধন্য। এ কি আনন্দের খেলা তোমার! একি বিরাট লীলা তোমার!

এই যুগে জাতির চোখে ফুটিয়া উঠে ভগবানের বিশ্বরূপ। তখন জাতি বুঝিতে শিখে ক্ষুদ্র কিছু নয়, নিরর্থক কিছু নাই;

দেখিতে শিখে ভগবানের সত্যমূর্ত্তি, চিন্ময় মূর্ত্তি, আনন্দময় মূর্ত্তি শুধু আপনাকে অনন্তরূপে প্রকাশ করিয়া আছেন। মানুষের জীবনে তখন প্রতিষ্ঠিত হয় তা'র সত্যধর্ম্ম। আর নব নব জ্ঞান নব নব কর্ম্মের দ্যোতনায়, নব নব শিল্প কলা, নব নব উৎসাহে মানুষ আপনাকে সার্থক করিয়া তুলে। মানুষ তখন ক্ষুদ্র নয়—ভগবানকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করিয়া সে তখন তাহার অধিকার বুঝিয়াছে। সে তখন দীন নয় হীন নয়—ভগবানের গৌরবে সে গৌরবান্বিত—তাঁহার ঐশ্বর্য্যে সে ঐশ্বর্য্যবান, তাঁহার শক্তিতে সে অটল অচল, তাঁহার বিশ্বাসে সে অমর। তখন মানুষকে থামাইবে কে—ঠেকাইবে কে? সে তখন আকাশের সহিত আপনার পরিমাণ করিতে চাহে, অশান্ত জলধিকে সে তাড়িত মথিত করিয়া আপনার শাসন বিস্তার করিতে চাহে। ভগবান তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা তাই আকাশের মত তাহার স্বাধীনতা—ভগবানের মন্দির সে, তাহার অশুচি কোথায়? ভগবান তাহার জন্য দায়ী—তাহাকে শাস্তি দিবে কে?

এই যে উত্থান পতন, জীবন মরণ, আলো আঁধার এ জাতির জীবনে কতবার ঘটিয়াছে তা কে জানে? আজ আবার আমরা জীবনে এক নবীন স্পন্দন অনুভব করিতেছি—সেটা এই, জাতির জীবনে নব জাগরণের স্পন্দন। ভগবানের কৃপায় এই জাগরণের দ্রষ্টা যাঁহারা, তাঁহারা এই স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের বিশ্বরূপ দিকে দিকে প্রকট দেখিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন ভগবানের লীলার অবধি নাই। তিনি অনন্তরূপে আসন সাজাইয়া, অসীম

আনন্দ বিস্তার করিয়া হাসিমুখে বসিয়া আছেন—ডাকিতেছেন—হে অমৃতপুত্রগণ—এস—বর গ্রহণ কর—অমর হও।

আমরা জানি ভগবানের এ আহ্বান কখন বৃথা হইবে না। ভগবানের আহ্বান কবে কোথায় বৃথা হইয়াছে? তাই আজি বাঙ্গালা দেশের মর্ম্মে মর্ম্মে এক দারুণ সন্দেহ জাগিয়া উঠিয়াছে। পন্থা কি? মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য কি? মানবের পূর্ণ সার্থকতা কিসে? কৃচ্ছ্রসাধনে ইন্দ্রিয়াদিকে পিষিয়া আপনাকে লয় করিয়া দেওয়ার জন্যই কি ভগবান মানুষকে এমন অমানুষী শক্তি, ধী, কর্ম্মশীলতা দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন? অথবা মন বুদ্ধি চিত্ত অহ-ঙ্কারকে ভগবানে প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহারি চৈতন্যে আমাদিগকে উদ্বোধিত করিয়া তাহাদের ভিতর দিয়া দেবলীলার উদ্‌যাপন হও-য়াই ভগবানের উদ্দেশ্য? এ সন্দেহ আজি জাগিয়াছে, ভগবানের ইসারায়। তাই মধ্যযুগের মানবজীবনের যে সমস্যাপূরণ তাহা আর কেহ আজ মানিয়া লইতে পারিতেছেন না।

ভগবানের সেই ইসারার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও আজি তাই ডাকিতেছি—এস ভাই সব, ঐ অনন্ত সুনীল গগনের নিম্নে আমরা মিলিত হই। ভগবানকে সংসার হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া আমরাই ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছি। এস আবার সেই নির্ব্বাসিত ভগবানকে অরণ্য-কান্তার হইতে ফিরাইয়া আনিয়া আমাদের গৃহে গৃহে তাঁহার আসন পাতিব। জননীর স্নেহে, পত্নীর আদরে, ভাই বন্ধুর প্রীতিতে, শিশুর হাসিতে আবার তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিব—আমাদের দৈনিন্দন

কর্ম্মে, অবসরে, চিন্তায়, আহারে বিহারে তাঁহাকে জীবন্ত করিয়া তুলিব। আমাদের অন্তরে অন্তরে তাঁহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া আমাদের মন বুদ্ধি চিত্তকে তাঁহারি চৈতন্যে চৈতন্যময় করিয়া তুলিব—বিরাট করিয়া তুলিব। তখন তাহাদের ভিতর দিয়া ভগবানের যে আলোক ফুটিবে—তাঁহার যে জ্ঞান প্রকাশ হইবে—তাঁহার যে আদেশ বিঘোষিত হইবে তাহাতে জগত আবার আর একবার সম্ভ্রমে, নতশিরে বলিবে—ভারতবর্ষ সভ্যতার আদি গুরু—তুমি ধন্য, তুমি পূজ্য।

ত্যাগের কথা

১

আমরা যারা নবীন—যাদের মনে উৎসাহ আছে, আশা আছে, অতীতের বোঝা যাদের প্রাণ হ'তে নবীন নবীন স্পন্দনের অনুভূতিকে দূর করে' রাখ্‌তে সক্ষম হয় নি—তাদের আজ লড়াই কর্‌তে হবে এই ত্যাগমন্ত্রের সঙ্গে। অতীত কালের এই যে ত্যাগমন্ত্রের প্রচার—যা'তে আমাদের কোন মতামত নেওয়া হয় নি—সেই ত্যাগমন্ত্রের দোষগুণ বিচার করে' দেখ্‌বার আজ সময় এসেছে। এ বিচার যারা সারাদিন মার্ত্তণ্ড-তাপে কাটিয়ে অবসন্ন দেহে শুষ্ক মুখে সন্ধ্যার আড়ালে তাদের ক্লান্তি দূর কর্‌বার জন্যে ঢলে' পড়্‌ছে তা'রা কর্‌বে না—ঊষার স্নিগ্ধ বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের বিপুল স্পন্দনের সাথে সাথে হাসিমুখে যারা আজ জীবন-মন্দিরে সাধকের বেশে প্রবেশ কর্‌তে যাচ্ছে তা'রা কর্‌বে। আমি আহ্বান কর্‌ছি আজ নবীনকে, পুরাতন আজ বিদায় নিক্।

আমার বেঁচে থাকার বিপুল পুলকের মধ্যে যে চিন্ময় দেবী আসীনা রয়েছেন, সে দেবীর আসন থেকে ত কিছু বাদ দেবার আদেশ আমার প্রাণে পৌছুচ্ছে না—সে দেবী যে নিশিদিন

আমাকে সমস্তকে আলিঙ্গন কর্‌তেই আদেশ কর্‌ছেন—আকাশের সঙ্গে বাতাসের সঙ্গে নরনারীর সঙ্গে যশমানের সঙ্গে ধন প্রতিপত্তির সঙ্গে, সবার সঙ্গেই প্রেম কর্‌তে ইসারা কর্‌ছেন—কারণ এই সবের ভেতরেই ত ভগবানের বিরাট লীলা মহীয়ান হ'য়ে রয়েছে। আর এই ত হচ্ছে গীতার কর্ম্মযোগ।

শিশুর শরীরে মধ্যে তা'র হাত পা ছোঁড়ায় একটা বিপুল আনন্দ রয়েছে—এতেই তা'র শারীরিক বিকাশের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি হয়। শিশুকে তা'র এই সনাতন স্বভাব থেকে বঞ্চিত করে' রাখ্‌লে শিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ত ভাল করে' গঠিত হবেই না এমন কি শিশু নূলো হ'য়েও যেতে পারে। মানুষ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এক হিসাবে ত শিশুই। সেই মানব-শিশুর সনাতন স্বভাব ত আপনার সমস্ত দিয়ে আপনাকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া—তা'র মন বুদ্ধি চিত্ত প্রাণ সমস্তকে আল্‌গা করে' এই বিরাট কর্ম্মের ক্ষেত্রে ছেড়ে দেওয়া। সেখানে সে আকাশ বাতাস থেকে নরনারীর কাছ থেকে, স্বভাবের কাছ থেকে সর্ব্বদা যে আনন্দ কুড়ুবে তা'তে তা'র জীবদেহের বিকাশ হ'য়ে হ'য়ে জীবনটা অনন্তের দিকেই ধাবিত হবে। তা না করে' তা'র অন্তঃকরণের সনাতন কর্ম্মশীল স্বভাবের উপর একটা মিথ্যা ত্যাগের বোঝা চাপিয়ে দিলে—তা'র অন্তঃকরণের যন্ত্রসমূহের ত উচ্ছেদ সাধন হবে না—তা'রা শুধুই নূলো হ'য়ে পড়বে। বুদ্ধি অসীম চিন্তার ক্ষমতা হারিয়ে নিয়ে থাকবে শুধুই অচঞ্চল অক্ষমতা, মনের বিরাট কল্পনার পরিবর্ত্তে থাকবে

শুধুই সঙ্কীর্ণ আকাঙ্খার বহ্নিরাশি, প্রাণকে হারিয়ে আমরা শুধুই হ'য়ে থাক্‌ব এই রক্তমাংসময় দেহের ক্রীতদাস।

অন্ততঃ আজ আমি ত চোখের সাম্‌নে এইটেই দেখ্‌তে পাচ্ছি। যখন আমি আমার দেশবাসীর সঙ্গে প্রতীচ্য জনসঙ্ঘের তুলনা করে' দেখি তখন দুয়ের মধ্যে প্রভেদ দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে যাই। আমার দেশবাসী যাদের মধ্যে গত কয়েক শত বৎসর কেবল ত্যাগ-মন্ত্রের প্রচার হয়েছে, যারা জন্মান্তর বাদ মানে তা'রা কেমন দৈন্যের সঙ্গে আপন আপন জীবনটাকে আঁকড়ে ধরে' রয়েছে। আর প্রতীচ্যের জনসমূহ, যারা ভোগের অদম্য স্রোতে আপনাদেকে ভাসিয়ে দিয়েছে, আকাঙ্ক্ষায় যাদের জীবন কাণায় কাণায় পূর্ণ, যাদের ধর্ম্ম তাদেকে একবার মর্‌লে আর ফিরে আসবার কোন ভরসাই দেয় না, তা'রা কেমন অবলীলাক্রমে আপনাদের জীবনটা ধরে' দিতে জানে। আসল কথা হচ্ছে তাদের প্রাণটা সজীব রয়েছে, তাদের জীবনে শক্তির অনুভূতি রয়েছে। আর আমাদের অন্তঃকরণ অনৃতময় ত্যাগের বোঝার নিম্নে নূলো হ'য়ে তা'র সমস্ত শক্তি হারিয়ে বসে' আছে। তাই আমাদের কাছে জীবন সুখহীন, আনন্দশূন্য—মরণ বেদনাময়, ভীতিজনক।

পাশ্চাত্য সভ্যতার দুরন্ত প্লাবন যে আমাদের জাতিটাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় নি তা'র কারণ এই হচ্ছে যে, এই জাতির নিম্নে একটা সনাতন ও বিরাট ভিত্তি সুদৃঢ় হ'য়ে চিরকাল রয়েছে। সেই ভিত্তিকে আশ্রয় করে' আমারা তারি উপরে যুগে যুগে নূতন নূতন ইমারত তৈরী করেছি। যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন

শিল্পী এসে সেই পুরাতন ইমারত ভেঙ্গে সেখানে নূতন ইমারত খাড়া করেছে। আমরা এই নবীন যুগে ত্যাগের সেই পুরাতন ইমারত ভেঙ্গে সেখানে নূতন মন্দির নির্ম্মাণ কর্‌ব, কারণ চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাচ্ছি যে পুরাতন ত্যাগের ইমারতের কড়ি বরগায় ঘুণ ধরেছে, তা'র দেয়াল ফেটে বড় বড় অশ্বথ গাছ বেরিয়েছে, তা'র ভেতর চামচিকে বাসা নিয়েছে। এই পুরাতন অস্বাস্থ্যকর ইমারতকে ভাঙ্গতে হবে—আর এই নবীনযুগে নবীন আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে সেখানে এক নবীন ইমারত গড়্‌তে হবে। এই আমাদের কাজ। এর জন্যে নবীন যারা তাদের আজ আমি আহ্বান কর্‌ছি।

মানুষ যখনই মেশামিশি করে তখন তা'রা পরস্পরকে কিছু দিয়ে যায়, পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে কিছু নিয়ে যায়। ব্যক্তি-গত ভাবে এই কথাটা যেমন সত্যি, জাতির পক্ষেও এটা তেম্‌নি ঠিক্। পাশ্চাত্য জাতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে রাষ্ট্রনীতি বলে' এক জিনিষের আমদানি হয়েছে। সেটা এদেশের পক্ষে খুবই নূতন। এই রাষ্ট্রনীতি ভাল কি মন্দ সেটা বিচার কর্‌তে আমরা বসিনি। তবে এটা পাশ্চাত্য জাতির সংস্পর্শের স্বাভাবিক ফল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশের জনসঙ্ঘের মধ্যে পাশ্চাত্যের সেই nation গঠিত হ'য়ে উঠ্‌ছে। এই nation গঠন কেউ রোধ কর্‌তে পার্‌বে না। কারণ পাশ্চাত্য জাতির জীবনের এটি সার এবং সত্য জিনিষ। এ গড়ে উঠ্‌বেই। এখন আমাদেকে ভগবানে পৌঁছোবার রাস্তাটাকে, দেশের জনসঙ্ঘের মধ্যে এই যে nation গঠনের প্রক্রিয়াটী চল্‌ছে, তা'র ভিতর দিয়ে ফেল্‌তে হবে

—এই দুটোর মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটিয়ে আমাদের সনাতন ধর্ম্মের সনাতনত্বের এবং সার্ব্বভৌমিকত্বের দাবী জগতের সাম্‌নে কর্‌তে হবে। তা না করে' আজ যদি আমরা ত্যাগ ধর্ম্মের প্রচার করে' সবাইকে সন্ন্যাসের পথ দেখিয়ে দি—তবে আজ এই জাতি প্রাণের মধ্যে যে স্পন্দনের অনুভূতি পাচ্ছে, তা'র অন্তরে যে-জিনিষটা আজ সত্যরূপে ছায়া ফেলেছে তা'র বিরুদ্ধে অনিচ্ছাসত্ত্বে গিয়ে সে আজ হয়ত মোক্ষলাভও কর্‌তে পার্‌বে না, অথবা অপর দিকে কেউ কেউ ত্যাগের মন্ত্রে কথঞ্চিত অনুপ্রাণিত হ'য়ে সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে জাতির মধ্যে nation গঠনের এই যে প্রাণালী চল্‌ছে তা'র সঙ্গে আপনাকে মিলাতে পারবে না। জাতির অন্তরে nation গঠনের আজ যে প্রক্রিয়া চল্‌ছে সে স্বধর্ম্মের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করে' জাতির অন্তর হ'তে ভগবানকেই হয়ত আমরা দূরে নিয়ে ফেল্‌ব অথবা কেউ কেউ তা'র দেশবাসীকে পরিত্যাগ করে' তা'র জাতীয় জীবনকে খর্ব্ব কর্‌বে।

কারণ দু-এক জন নিয়ে আর এখন আমাদের কারবার করা চল্‌বে না। পৃথিবীর এম্‌নি সময় এসেছে যে আজ আমাদের কারবার কর্‌তে হবে সমস্ত জাতিটাকে নিয়ে—সমস্ত জাতিটার কথা ভাব্‌তে হবে। মানুষের ভগবানে অনুরাগ যেমন সত্য ও স্বভাবজ (instinctive), তা'র ভোগাকাঙ্খা ও কর্ম্মশীলতাও তেমনি সত্য ও স্বভাবজ। এতকাল আমরা এ দুটোকে বিরুদ্ধ করেই মেনে নিয়েছি। মানুষের যে-অংশটায় ভোগাকাঙ্ক্ষা ও কর্ম্মশীলতা বাস করে সে-অংশটাকে আমরা চিরকাল শাসিয়ে

এসেছি যে তোমার ভগবানে অধিকার নেই। সে'ও তাই মেনে নিয়ে আত্মগ্লানিতে পূর্ণ হ'য়ে একদিকে ভগবান থেকে' দূরে চলে' গেছে, অপর দিকে ত্যাগের ও সন্ন্যাসের চেষ্টা করতে গিয়ে বৈরাগ্যের পরিবর্ত্তে শুধুই সঙ্কীর্ণতাকে আলিঙ্গন করেছে, তা'র জীবনে বৃহতের পরিবর্ত্তে শুধুই ক্ষুদ্রতাকে টেনে এনেছে—অনন্তকে ধরতে গিয়ে শুধুই সঙ্কোচকে বরণ করে' নিয়েছে। আজ আমাদের এই ভোগাকাঙ্ক্ষা এবং কর্ম্ম-শীলতার ভিতর দিয়ে এমন কি তাদেকে সহায় করে' ভগবানের পন্থা খুঁজে বের করতে হবে। দেশবাসীকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে ভোগে দোষ নেই, কর্ম্মে আনন্দ আছে। তাদের প্রাণে প্রাণে এই সত্যটাই ফুটিয়ে তুলতে হবে যে, যখন ছোট হ'য়ে ভগবানকে লাভ করা যায় তখন বড় হ'য়েও যায়; দরিদ্র হ'য়ে যদি তাঁর সত্তা উপলব্ধি করা যায় তবে ঐশ্বর্য্যশালী হ'য়েও তা করা যায়। নবীন যুগের এই কাজ। আর এই হবে ভারতের Renaissance.

এই Renaissance হচ্ছে আমাদের দেশবাসীর ভবিষ্যৎ। এই Renaissence না হ'লে জাতির মধ্যে কতকগুলি লোক তা'র দেশবাসীকে পরিত্যাগ করে' আপনার নিজেকে ব্যক্তিগত ভাবে পৃথক করে' নিয়ে এ সংসার ছেড়ে চলে যাবে—আর অব-শিষ্ট যারা তা'রা ভগবানকে হারিয়ে ত্যাগমন্ত্রের বুলি কপ্‌চিয়ে কপ্‌চিয়ে জীবন্মৃত ভাবে আপনাদের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে সংসারে কষ্ট ভোগ করতে থাকবে। এতে আমাদেরও কোন মঙ্গল হবে না আর জগতেরও কোন লাভ নেই।

কারণ আমি বিশ্বাস করি যে জগতের প্রতি এই ভারতবর্ষের একটা বিধিনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য রয়েছে। এই Renaissance না হ'লে সে কর্ত্তব্য সাধন করা হবে না। ভোগের সঙ্গে ভগবানের সামঞ্জস্য ঘটাতে না পার্‌লে আমরা জগতকে টান্‌তে পার্‌ব না। ত্যাগের সঙ্গে কর্ম্মকে যুক্ত কর্‌তে না পার্‌লে আমরা তাদেকে আমাদের সনাতন ধর্ম্মের যে রহস্য তা বুঝাতে পার্‌ব না। তাই এই Renaissance এর প্রয়োজন। তাই আমি আজ আমার দেশবাসীকে নূতন করে' সাড়া দিতে প্রাণের মধ্যে নূতন করে' সাড়া পেতে আহ্বান কর্‌ছি। আজ আমার দেশবাসীর জীবনে কবির বাণী সত্যরূপে ফুটে উঠুক—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।

২

অর্জ্জুন যখন যুদ্ধ কর্‌তে চাইছিলেন না, ভগবান তখন তাঁকে বলেছিলেন—

মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয়—

আমার যেন মনে হয় আমরা ত্যাগধর্ম্মকে আলিঙ্গন করে' ধীরে ধীরে আমাদের জীবন-সংগ্রামে ক্লীবতাকেই আশ্রয় করেছি। প্রথম যে-মহাপুরুষ এই ত্যাগধর্ম্মের প্রচার করেন তিনি এই

মন্ত্রের মধ্যে যে-শক্তি চালিত করেছিলেন সে-শক্তি কালবশে হীন হবারই কথা। তাই এখন সে মন্ত্র আর নেই—শুধু আছে তা'র শব্দ এবং রূপ। তাই এখন এ মন্ত্র দেশবাসীকে প্রকৃত পক্ষে উদ্বোধিত না করে' শুধু তাদেকে একটা আলস্যের এবং ঔদাসিন্যের খোলসই পরিয়ে দিয়ে যায়। আর এই আলস্য ও ঔদাসিন্যকে আশ্রয় করে' ক্লীবতা আমাদের মধ্যে ধীরে ধীরে মাথা তুলেছে। আমাদের না-চাওয়াটা, যেটা আগে সত্যি করে' না-চাওয়া ছিল এখন সেটা "পাইনে বলে' চাইনে" হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এ স্রোত ত ফিরাতে হবে—এ ত প্রকৃত মোক্ষ নয়, এ যে বিরাট অক্ষমতা—এ ত মুক্তি নয়, এ যে মৃত্যু। যে-স্রোতে আমরা ভেসে চলেছি সে-স্রোত থেকে বাঁচ্‌তে হ'লে ত তা'র বিপরীত দিকেই দাঁড় টান্‌তে হবে। তাই আমরা আজ নিবৃত্তিমার্গকে ত্যাগ করে' প্রবৃত্তিমার্গকে বরণ করে' নেব।

যদি কেউ আমাদেকে আজ জিজ্ঞেস করেন যে তোমাদের এ পন্থা পরিবর্ত্তনের কারণটা কি?—তবে আমরা বল্‌ব যে আমরা আজ মানুষকে নতুন ভাবে দেখ্‌তে শিক্ষা করেছি, মানুষের এক নতুন সার্থকতা খুঁজে পেয়েছি। সে সার্থকতাটা মানুষের বাহুতে যে বল রয়েছে, প্রাণে প্রাণে যে পুলক রয়েছে, হৃদয়ে হৃদয়ে যে স্পন্দন রয়েছে, মনে মনে যে আশা আকাঙ্খা রয়েছে, মর্ম্মে মর্ম্মে যে স্বপ্ন রয়েছে—তা'র অর্থে অর্থে পূর্ণ। সে সার্থকতা হচ্ছে—মানুষের মানুষত্বের বিলোপ সাধন করে' জীবাত্মাকে ব্রহ্মপদে লীন করে' না দিয়ে—এ আনন্দময় জগত জুড়ে শ্রীকৃষ্ণের যে বাঁশী

বাজ্‌ছে সেই বাঁশীর তালে তালে নৃত্য করা। এ জগতকে আমরা দুঃখময় বলেই জানি না। মানুষের সমস্ত জীবনের মধ্যে, তা'র প্রবৃত্তির খেলার মধ্যে একটা নিগূঢ় সন্ধান আমরা পেয়েছি— সেটা স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, ফাঁকি কথা নয়—কারণ তা'রও প্রতিষ্ঠা হচ্ছে চিদ্‌ঘন আনন্দেরই ওপরে। আমরা আজ মানুষের অধ্যাত্ম ও অধিভূতের মধ্যে এক নিগূঢ় রহস্যময় সম্বন্ধ খুঁজে পেয়েছি— বুঝেছি এরা মানুষের জীবনে পরস্পর বিরোধী নয়—পক্ষান্তরে এরা পরস্পর পরস্পরকে পূর্ণ করেই চলেছে—এদের একের তৃপ্তিতে অপরের তৃপ্তি, একের সন্তোষে অপরের সন্তোষ, একের আনন্দে অপরের আনন্দ—অধ্যাত্মে এবং অধিভূতে সমান ভাবে ভগবান বিরাজ কর্‌ছেন, সমান ভাবে তাঁর লীলা প্রকট হ'য়ে আছে। আমরা এই মানুষ নামক ফুলটীকে সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত করে' তা'র সমস্ত গুণরাশিকে বিকশিত করে' তা'কে তা'র সমস্ত মহিমায় সমস্ত ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত করে' ভগবানের শ্রীচরণে উৎসর্গ করে' দিতে চাই। এটাই আমাদের ভিতরের কথা। আর সেটা হ'তে পারে শুধুই প্রবৃত্তিমার্গের ভিতর দিয়ে।

অনেকের একটা মস্ত ভুল ধারণা আছে যে প্রবৃত্তিমার্গটা নিবৃত্তিমার্গ চাইতে অমঙ্গলময় এবং বিপদসঙ্কুল। আসল কথা হচ্ছে এই সৃষ্টিতে এমন কোন জিনিষ নেই যা অমঙ্গলময়। আবার এমন কোন জিনিষ নেই যাকে আশ্রয় করে' অমঙ্গল জন্মলাভ কর্‌তে না পারে। সবই মানুষের বুঝবার দোষে আপনাকে চালাবার দোষে। স্ত্রীলোকের রূপরজ্জু গলায় বেঁধে যদি পুরুষ

আত্মহত্যা করে তবে স্ত্রীলোককে সংসার থেকে উচ্ছেদ কর্‌লে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। প্রবৃত্তির পথটা যদি বিপদসঙ্কুল হয় তবে নিবৃত্তির পথটাতেও কম বিপদ নেই। তবে যে প্রবৃত্তিটাই আমাদের বদ্‌নাম গায়ে জড়িয়ে সংসারে হেয় হ'য়ে আছে তা'র কারণ এই হচ্ছে যে, প্রবৃত্তির খারাপ ফলটাকে আমরা চর্ম্মচোখ দিয়ে যতটা দেখি ততটা নিবৃত্তির খারাপ ফলটাকে দেখ্‌তে পাইনে। কারণ প্রবৃত্তির খারাপ ফলটা বাইরে ফুটে ওঠে আর নিবৃত্তির ফলটা ভিতরে জন্মাতে থাকে। আর আমাদের মধ্যে ক'জনা ভিতরের খবর রাখ্‌তে পারে? যেমন প্রবৃত্তির বিপদ হচ্ছে মানুষকে ধীরে ধীরে রাজসিকতায় বাড়িয়ে বাড়িয়ে তা'কে দানবত্বে অসুরত্বে স্থাপিত করা, তেমনি নিবৃত্তির বিপদ হচ্ছে মানুষকে ধীরে ধীরে সাত্ত্বিক না করে' তুলে তামসিকতার দিকে নিয়ে গিয়ে তা'কে জড়ত্বে পূর্ণ করা। কারণ সাত্ত্বিকতা আর তামসিকতার এমনি চেহারা যে বাহির থেকে তাদেকে প্রায় এক বলেই বোধ হয়। আমার মনে হয় আমাদের দেশবাসী এই দ্বিতীয় অবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল।

তবে যদি কেউ আমাকে জড় এবং দানবের মধ্যে তুলনা কর্‌তে বলেন—তবে আমি নিঃসন্দেহেই বল্‌ব যে দানবই শ্রেষ্ঠতর। কারণ জড় যে সে কাউকেই আপনার বলে' জানে না, কিন্তু দানব যে সে সমস্ত বিশ্বকে না হোক্‌ অন্ততঃ তা'র দেশটাকে আপনার বলে' জানে। আর বিশেষতঃ দানব যে তা'কে পরিবর্ত্তন করা চল্‌তে পারে, কিন্তু জড়ের নড়া চড়া পর্য্যন্ত নেই—দানবকে দেবতা করে' তোলা সম্ভব হ'তে পারে কিন্তু জড় যে

তা'কে জন্ম জন্ম তপস্যা কর্‌তে হবে জীব হবার জন্যে—তখনই তা'র সম্বন্ধে কোন কথা কওয়া চল্‌বে। প্রকৃত কথা হচ্ছে যে প্রবৃত্তিই হোক্ আর নিবৃত্তিই হোক্ অজ্ঞানতার সঙ্গে এ দুটোর যে-কোনটার মিলন হ'লে তা ভয়াবহ হ'য়ে উঠে। তবে অজ্ঞানতা-পূর্ণ নিবৃত্তি চাইতে অজ্ঞানতাময় প্রবৃত্তি অনেক ভাল।

আজ যে মহাকালীর তাণ্ডব নৃত্য ইয়োরোপের আকাশে বজ্রশিখা ছড়াচ্ছে তা'তে আমাদের মধ্যে অনেকের হৃদয়-তলের রক্তরাশি হিম হ'য়ে গিয়েছে। তাঁরা সভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করে' শিউরে শিউরে উঠ্‌ছেন আর ইয়োরোপের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে' বল্‌ছেন "দেখ দেখ ভোগের কি ভীষণ পরিণাম—কি ভীষণ ওদের মৃত্যুকে আলিঙ্গন"। কিন্তু যাঁরা ত্যাগকে পরম মন্ত্র বলে' বরণ করে' নিয়েছেন—যাঁরা এ জগৎ নশ্বর বলে' দিবানিশি জপ কর্‌ছেন—তাঁরা যে মানুষের মরণটাকেই মানুষের জীবনের চরম দুর্ঘটনা বলে' মনে করেন কেন সেটা একটু আশ্চর্য্যের কথা এবং একটু ভেবে দেখ্‌বারও কথা বটে। কারণ এটা মান্‌তেই হবে যে যারা এ যুদ্ধে যাচ্ছে তা'রা অন্ততঃ কেউ ব্যক্তিগত লাভের আশায় প্রাণপণ করে নি, কারণ তা'রা সকলেই জানে যে এ যুদ্ধে ফিরে আসার চাইতে মরণের সম্ভাবনাটাই, অথবা তা থেকেও বিশ্রী ব্যাপার দু'একখানি অঙ্গহানির সম্ভাবনাই বেশী। আর যাঁরা যুদ্ধকে ভোগের স্বাভাবিক পরিণতি বলে' নির্দ্দেশ করেন তাঁরা ভুলে যান যে ত্যাগের, প্রেমের, দয়ার অবতার ভগবান ঈশার জন্যে যত যুদ্ধ হয়েছে, লোক হত্যা হয়েছে, অত্যাচার

হয়েছে আর কোন কারণে তত হয়েছে কি না সন্দেহ। আসল কথা যুদ্ধ জিনিষটা বিশ্বমানবেরই একটা ব্যাধি—যদি ব্যাধি বলেই একে ধরা যায়। অবশ্য এ সম্বন্ধে ভিন্ন মতও থাকৃতে পারে।

কিন্তু যাঁরা ইয়োরোপের এই হতাহতের সংখ্যা গণনা করে' আজ এতটা শিউরে উঠ্ছেন তাঁরা আমাদের দেশে বছর বছর লক্ষ লক্ষ লোক যে দুর্ভিক্ষ ম্যালেরিয়া প্রভৃতিতে অসহায়ভাবে অদৃষ্টকে দোষ দিতে দিতে মরে' যাচ্ছে তা'তে ততটা শিউরে ওঠেন না—আদবে শিউরে ওঠেন কি না সন্দেহ।—তা'র কারণ হচ্ছে এই যে—কামানের গোলাগুলি, সঙ্গীনের খোঁচা খুঁচি প্রভৃতি যুদ্ধের উপকরণ গুলো আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়ের ওপর একটা অসচ্ছন্দতাপূর্ণ ভাব সৃষ্টি করে' যায় যাতে করে' আমাদের মন একটা বেদনাময় ধাক্কা পেয়ে যায়। গভীর নিশীথে শান্তিময় নিদ্রার ক্রোড়ে সুষুপ্ত নরনারীর ওপর জ্যেপ্‌লিন থেকে বোম্ ছোঁড়া, জ্বলন্ত গুলি একটা বুক দিয়ে. ঢুকে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া, তক্ তক্ কর্‌ছে একটা সঙ্গীন, সেটা একটা জীবন্ত মানুষের পেটের মধ্যে চন্ চন্ করে' ঢুকে যাওয়া—এ সমস্ত আমাদের sense-planeএ এমন একটা বিভীষিকাময় ভীতির সৃষ্টি করে' যায় যে তা'তে আমরা এসব মানস চোখে দেখে শিউরে উঠি। কিন্তু ঐ যে দুর্ভিক্ষ কিম্বা ম্যালেরিয়াতে মরে' যাওয়া—যা'তে যেমনকার দেহ তেমনি থাকে, হাত পা চোখ কাণ সব ঠিক ঠিক—কিন্তু যাতে করে' মানুষের মনুষ্যত্বকে পলে পলে তিলে তিলে চুষে চুষে চিবিয়ে চিবিয়ে মানুষের ভিতর থেকে বের করে' দিয়ে অবশেষে তা'কে

মরণের বিস্মৃতিময় ক্রোড় দেখিয়ে দেয়, তা'তে আমরা ততটা ভয় বোধ করি না। কারণ ভিতরের কথা কে তলিয়ে বুঝ্‌তে চায়, দেখ্‌তে চায়। কারণ একটী মৃত্যু কোলাহলময় শোণিতাক্ত কলেবর—রাজসিক; আর একটী মৃত্যু নীরব, নিস্পন্দ, জড়ের মত—তামসিক। আমাদের অস্ত্রধারণ কর্‌তে হবে এই তমের বিরুদ্ধে। আর তমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে হ'লে রজঃকে আশ্রয় কর্‌তেই হবে। কারণ সত্ত্বের aggressiveness নেই।

৩

মানুষের দুটো দিক। একটা ধরে' রাখার দিক, একটা ছেড়ে' দেওয়ার দিক। মানুষের জীবনে যা কিছু সত্যি তা এদের দুটোকে নিয়ে। মানুষ যেখানে কেবল আপনাকে ধরেই রেখেছে সেখানে সে পরিণামে পরিণত হয়েছে জড়ে—তা'র চারপাশে গড়ে' উঠেছে অচলায়তনের আলোঢাকা বাতাস বন্ধ করা বিরাট প্রাচীর। আর যেখানে সে আপনাকে শুধু ছেড়েই দিয়ে আছে সেখানে তা'র পরিণামে চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে যাওয়ারই সম্ভাবনা—হয় প্রকৃতির শক্তির সংঘর্ষে, নয় পারিপার্শ্বিকের শক্তির সংঘর্ষে এসে—যদুবংশের মত, হয়ত বর্ত্তমান ইয়োরোপের মত। এই দুটোকেই যোগের ভাষায় আমরা বলি নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি মার্গ।

এই যে ধরে' রাখা আর ছেড়ে দেওয়া তা রবীন্দ্রনাথ বেশ ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর "অচলায়তন" নাটকের মহাপঞ্চককে আর

পঞ্চকে। সেই যে অচলায়তন, যেখানে বাইরের আলো বাইরের বাতাস প্রবেশ করে না, যেখানে উত্তর দিকের জানালা খুলে চাইলে মুহূর্ত্তে চোখ দুটো পাথর হ'য়ে যাওয়ার সম্ভাবনা—আর চোখ দুটো কপালক্রমে পাথর হ'য়ে না গেলে—মহাতামস নামক ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বার দুর্ভাবনা—সেই অচলায়তনে যে পঞ্চকের বুক চিরে গলা কেটে ক্রন্দনের সুরে গান বেরিয়ে আসে—

বেজে ওঠে পঞ্চমে স্বর
কেঁপে ওঠে বন্ধ এ ঘর,
বাহির হ'তে দুয়ারে কর
কেউ ত হানে না।

সে গান পঞ্চকের একার নয়। সে গান বিশ্বমানবের সকলের। এ গান বসন্তাগমে রুদ্ধকণ্ঠ কোকিলের আকুলতার মত। এ গান ছায়ায় বর্দ্ধিত কুসুমলতার আলোর দিকে ধাওয়ার মত। অন্ধকারময় ক্ষুদ্র কুটুরীতে সমস্ত থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে শুধু আপনাকে নিয়ে শান্তিতে সমস্ত জীবনটা কাটিয়ে দেওয়ায় যতই বাহাদুরীর কাজ হোক্ না কেন—মানুষের জীবন-দেবতার সত্যিকার কথা সেটা নয়। সে যে চায় আলো, সে যে চায় বাতাস—সে যে চায় নৃত্য গীত, হাসি কান্না, জয় পরাজয়—সে চায় তা'র ভিতরের সঙ্গে বাহিরের মিলন—তা'র অন্তরের রঙে বিশ্বটা রঙিয়ে তুল্‌তে, বিশ্বের রঙে অন্তরটা পূর্ণ কর্‌তে। এক কথায় সে চায় ছাড়া পাওয়া, বিশ্বের মাঝে আপনার সত্যিকার স্থান খুঁজে নিতে—আপনাকে চিনিয়ে

দিতে, ছড়িয়ে দিতে, লুটিয়ে দিতে। আর তাই মহাপঙ্ককের সঙ্গে তা'র চিরকালের অমিল। "অচলায়তন" তা'র চিরদিনের মরণ-সমাধি। কিন্তু বিরাট হিন্দুজাতি ক্রমে ক্রমে একটা বিরাট মহাপঙ্ককে গড়ে' উঠ্‌ছিল। আর তাই হিন্দু বিশ্বের দিকে তাকায় নি, বিশ্বও হিন্দুকে বুঝ্‌তে পারে নি, চিন্‌তে পারে নি, এমন কি তা'কে অবজ্ঞাই করে' এসেছে।

হিন্দু সামাজ একটা বিরাট মহাপঙ্ককে গড়ে' উঠুক তাই বলে' যে এই হিন্দুসমাজের মধ্যে যাঁরা বাস কর্‌ছেন তাঁরা সব নির্ব্বাণ মুক্তি প্রাপ্ত হয়েছেন অথবা সবাই কর্ম্মহীন ভোগহীন হয়েছেন তা নয়। কারণ এর বিরুদ্ধে প্রমাণ অত্যন্ত স্পষ্ট, যাঁরা সত্য দেখ্‌তে কুণ্ঠিত বা ভীত নন্ তাঁদের কাছে। অন্যান্য জাতির মতই অন্যান্য দেশবাসীর মতই হিন্দুদের মধ্যেও সেই জন্ম মৃত্যু, সেই বিবাহ পুত্রোৎপাদন, সুখে হর্ষ দুঃখে বিষাদ, সেই স্নেহ প্রীতি প্রেম বিদ্বেষ, সেই সবই চলে' আস্‌ছে, তা'র কোন ব্যতিক্রম হয় নি। তবে এই একটু প্রভেদ যে এরা—হিন্দুরা—কথায় কথায় ভগবানের নাম করে—আর সেই সঙ্গে সঙ্গে এদের ললাট চোখ মুখ সমস্ত নিয়ে তা'র ওপরে একটা নিষ্ঠুর কথা বড় বড় অক্ষরে লেখা হ'য়ে গেছে যে তা আর কারও ভুল কর্‌বার যো নেই—সে কথাটা হচ্ছে—অক্ষমতা। যখন জার্ম্মাণী শ্যেন পক্ষীর মত বেগে তা'র বিশাল চমূ নিয়ে প্যারিসের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তখন যদি সমস্ত ফরাসী জাতি হাত গুটিয়ে ভগবানের নাম কর্‌তে কর্‌তে আপনাদের ভক্তির (?) চরমোৎকর্ষ দেখাতে বসে' যেত তবে কি [illegible]
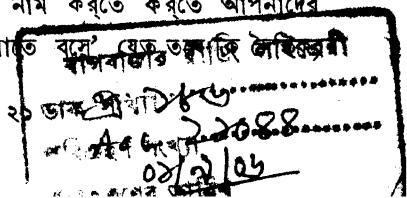
কি মানসিক, কি ব্যবহারিক, কি নৈতিক, কি আধ্যাত্মিক—কোন দিক থেকে যে সেটা প্রশংসনীয় হ'ত তা পৃথিবীর কেউ কোন দিন আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে না বোধ হয় এক অক্ষমতা পূর্ণ, শক্তিহীন, জীবনশূন্য হিন্দু ছাড়া। কিন্তু হিন্দু ঐ সময়ে ফরাসীদের ঐরূপ ব্যবহার যে প্রশংসনীয় তা আবিষ্কার করলেও তা'র মানে এ হবে না যে আজকার হিন্দু অন্যান্য দেশ জাতি চাইতে একটা কিছু মহৎ, বৃহৎ—বা একটা চিদ্‌ঘন আনন্দরূপ লাভ করেছে—তা'র মানে এই যে আজকার হিন্দু এমন একটা "জড়ভরত" অবস্থায় এসে পৌঁছেচে যেখান থেকে সে আত্মমর্য্যাদা, আত্মসম্মান প্রভৃতি মনুষ্যোচিত গুণাবলী প্রাণে প্রাণে অনুভব করতে অক্ষম—যেখান থেকে সে দেশের মঙ্গল, জাতির মঙ্গল প্রভৃতিতে আপনার ব্যক্তিগত অস্তিত্বকে যোগ করতে ব্যাথা বোধ করে। তাই এখন "আপনি বাঁচলে বাপের নাম" "চাচা আপন প্রাণ বাঁচা" "আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি" ইত্যাদি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে এদেরি মন্ত্র। আমরা এখন মরে' বাঁচতে চাইনে, বেঁচে মরে' থাকতে ভালবাসি।

কিন্তু এইখানে একটা কথা উঠতে পারে যে বাঁচাই বা কা'কে বল আর মরাই বা কা'কে বল? পূর্ব্বগত ধর্ম্মোপদেষ্টারা ত আমাদেকে শতাব্দী ধরে' শুনিয়ে এসেছেন যে—এই যে মাটী—এ ত সবার পায়ের নীচেকার মাটী—ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, ঐহিক, সে ত নরক তুল্য—তা'র মধ্যে থাকা সে ত মৃত্যুরই সামিল—ছাড় ছাড় সে সব—সে সব ছেড়ে ছুড়ে তুলে' ধর আপনাকে সেইখানে—যেখানে

চিদ্‌ঘন আনন্দ নিয়ে বসে' আছে স্থাণুর মত নিশ্চল অক্ষর ব্রহ্ম—সেখানে গিয়ে বস—সেই ত বাঁচা, সেই ত জীবন—আর যা কিছু সব ক্ষুদ্র তুচ্ছ, মানুষের জীবনের কলঙ্ক—পশুর উপযুক্ত তোমার নয়। শতাব্দী শতাব্দী ধরে' এই যে মন্ত্র আমাদের কাণে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়েছে তা সত্ত্বেও পৃথিবীটা যেমন চলে' আস্‌ছিল তেমনি চলে' আস্‌ছে আর আমরাও সবাই বুদ্ধত্ব লাভ করে' শূন্যে মিলিয়ে যাইনি, এই মায়া এবং নির্ব্বাণমন্ত্রের ঝড়ের ভিতর দিয়েও আমরা বেঁচে এসেছি—ক্ষতির মধ্যে শুধু এই হয়েছে যে আমরা মনমরা আর শক্তিহীন হয়েছি—যা হোক্ এসব সত্ত্বেও যে আমরা টিকে আছি—তা'র মানেই হচ্ছে—এই পৃথিবী, এই মানুষ এই লীলা এদের এমন একটা সত্যতা আছে যেটা মানুষের নির্ব্বাণ মুক্তির চাইতে বড়। আর সেই সাহসেই আজ আমরা জোর করে' বল্‌তে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত বা ভীত হচ্ছি না যে—বাঁচা—সে মানুষের মাথার চুল থেকে আরম্ভ করে' পায়ের নখাগ্র পর্য্যন্ত, তা'র অন্নময় কোষ থেকে বিজ্ঞানময় কোষ পর্য্যন্ত সবার সার্থকতা সম্পাদন। মানুষের এই জমিদারীতে কেউ যেন অনাহারে না মরে। সে যেন দেহ থেকে আরম্ভ করে' তা'র মন বুদ্ধি চিত্ত বিজ্ঞান সবার আহার যুগিয়ে চলে। তা'র জীবনে যেন কর্ম্মের অভাব না হয়, রসের অভাব না হয়, জ্ঞানের অভাব না হয়। এই হচ্ছে বাঁচা। ভগবান মানুষকে ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত করে' সৃষ্টি করেছেন। মানুষ যদি সে ঐশ্বর্য্যের অমর্য্যাদা করে, তবে ভগবানও মানুষের মর্য্যাদা রাখ্‌বেন না নিশ্চয়। মানুষ সে ঐশ্বর্য্য নিয়ে

বিশ্বমানবের মহামেলায় হাজির হবে, নিজে দেখ্‌বে—অপরকে দেখাবে—পরস্পর পরস্পরকে বুঝ্‌বে চিন্‌বে। এই হচ্ছে বাঁচা। ব্রহ্মে লীন—সেটা আত্মার লীলা-বিরতির অবস্থা—এ সৃষ্টি-লীলায় বাঁচার চিহ্ন কিছুতেই নয়। আর আমরা বাঁচতে চাইই—সে সম্বন্ধে একটুকুও কোনখানে ভুল নেই।

এই যে শতাব্দী শতাব্দী ধরে' ত্যাগের মন্ত্র, নির্ব্বাণের তন্ত্র, বৈরাগ্যের যন্ত্র আমাদের বাঁধ্‌বার চেষ্টা করেছে তা'তে আমরা কি আজ কর্ম্ম করি না? করি। কিন্তু সে কর্ম্মে এমন কিছু বৃহৎ নেই, মহৎ নেই যা আমাদেকে, আমাদের জীবনকে মহত্ত্ব অনুভব করিয়ে দিতে পারে। কর্ম্মের ভিতর দিয়ে যে কোন দিন মহত্ত্ব অনুভব করে' নি, কর্ম্মের আনন্দরূপ সে ত কোন দিন দেখ্‌তেই পাবে না—আর সে ত জীবন থেকে কর্ম্মকে সরিয়ে ফেল্‌বারই চেষ্টা কর্‌বে। যে আপনার মধ্যে কোন দিন মহত্ত্ব অনুভব করে নি, সে জীবনের আনন্দ বুঝ্‌বে কি, ভগবানের মহত্ত্ব বুঝ্‌বে কি? তাই আমাদের মধ্যে ধীরে ধীরে মায়াবাদটাই সত্য হ'য়ে উঠেছে। আজকার হিন্দু কি ভোগ করে না? করে। কিন্তু সে ভোগে কোন বিরাটত্ব নেই, কোন গৌরববোধ নেই। আর তাও আবার ভয়ে ভয়ে, যেন তা'রা একটা কি রকম ভয়ঙ্কর দুষ্কর্ম্মই কর্‌ছে। আর তাই তাদের ভোগ তাদের আনন্দের কারণ না হ'য়ে, তাদের চারিপাশে বন্ধন হ'য়ে ঘিরে আছে। হিন্দু কি চিন্তা করে না? করে, কিন্তু সে চিন্তা আপনার চারিপাশেই ঘুরে ফিরে আবার আপনাতে এসেই লয় হয়। আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাঁরা

তাদের চিন্তা যায় বড় জোর "দরিদ্র নারায়ণের সেবা" পর্য্যন্ত। কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্ব চায় সেই চিন্তা যা এমন পন্থা বের কর্‌বে যাতে করে' দেশে আর "দরিদ্র নারায়ণ" জন্ম নেবারই সুযোগ পেয়ে উঠ্‌বে না।

সুতরাং এত করেও যখন মানুষের কর্ম্ম ও ভোগ রয়েই গেল তখন এ কথা মনে করা নিতান্ত অসমীচীন হবে না যে মানুষের এই কর্ম্ম ও ভোগের এমন একটা সৎরূপ আছে যে মানুষ তা কতকটা গুপ্ত করে' রাখ্‌তে পারে কিন্তু সে তা লুপ্ত কর্‌তে পারে না। যখন কর্ম্ম ও ভোগ থাকৃলই তখন জীবকে এই কর্ম্ম ও ভোগকে প্রতিষ্ঠা কর্‌তে হবে সত্যের ওপরে, মঙ্গলের ওপরে। কারণ এই কর্ম্মের ভিতর দিয়েই সমাজের দেশের বিশ্বের কল্যাণ আস্‌বে—এই ভোগের ভিতর দিয়েই মানুষের জীবনদেবতার তৃপ্তি আস্‌বে, মুক্তি আস্‌বে। আর যেখানে এই কর্ম্ম ও ভোগ আপনার সত্য ও মঙ্গলময়রূপ নিয়ে আপনাকে প্রকাশ কর্‌তে সক্ষম হবে সেখানেই আবির্ভাব হবে সুন্দরের। আর এই হচ্ছে এ সৃষ্টির চরম অভিলাষ, চরম উদ্দেশ্য—সুন্দরকে প্রকাশ করা।

৪

এমন অনেকে আছেন যাঁদের কর্ম্মে কোন আপত্তি নেই কিন্তু ভোগের নাম শুন্‌লে তাঁদের মনে হয় যে সৃষ্টি, সমাজ, সংসার, মানুষের ইহকাল পরকাল—তা'র নৈতিক আধ্যাত্মিক সকল দিক

একেবারে রসাতলে গেল। এই ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত বাংলাদেশে ভোগের কথা শুন্‌লে এঁদের অনেকেরই পেটের মধ্যেকার পদার্থ-বিশেষ চম্‌কে যায়। এঁরা অপরের কানে কানে না হোক্‌ অন্ততঃ নিজের মনে মনে আওড়াচ্ছেন—"কর্ম্ম করব ভোগ করব না"। এই যে ভোগ বাদ দিয়ে কর্ম্ম—এই সূত্রটী নিয়ে একটু আলোচনা কর্‌লে ক্ষতি হবে না কিছুই, কিন্তু লাভের সম্ভাবনা আছে বিস্তর। এই ভোগ আর কর্ম্মকে—অথবা সঠিকভাবে বল্‌তে গেলে কর্ম্ম আর ভোগকে আমরা দেখ্‌তে চেষ্টা করব দুটো দিক থেকে। প্রথম মানুষের মনস্তত্বের দিক থেকে আর দ্বিতীয় ভগবানের সৃষ্টিতত্ত্বের দিক থেকে। এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা হওয়া দরকার, কারণ এই কর্ম্মে আর ভোগে এম্‌নি একটা সম্বন্ধ আছে যে এদের দুটোর মধ্যে যে-কোন একটাকে বাদ দিয়ে আর একটাকে নিয়ে জীবনযাপন কর্‌তে চাইলে মানুষের যা মিল্‌বে সেটা কর্ম্মও নয় ভোগও নয়—সেটা হচ্ছে কর্ম্মভোগ।

যাঁরা কর্ম্মের পক্ষপাতী অথচ ভোগের বিরোধী তাঁদেকে এই একটা সমীচীন প্রশ্ন করা যেতে পারে যে—তাঁরা যে কর্ম্ম কর্‌তে চান সেটা কি জন্য। এ থেকে বড় প্রশ্নটাও গড়িয়ে আসে যে—মানুষ আদৌ কর্ম্ম করে কেন? এর উত্তর দু'রকমের লোকে দু'রকমে দেবেন। এক রকম যাঁদের দৃষ্টি স্থূল—এই সৃষ্টির ওপরে ওপরেই যাঁদের চোখ পড়ে' থাকে—বাহিরের আবরণ ভেদ করে' যাঁরা সৃষ্টির ভিতরকার আসল সত্যের কাছে পৌঁছোতে পারেন না—যাঁরা সমস্ত ঘটনার চর্ম্মচক্ষে দৃশ্যমান কারণটাকেই ভিতরের সত্যম্‌ ঋতম্‌,

যার ওপরে সেটা প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে আছে সেইটে বলে' ভুল করেন—আর একরকম—যাঁদের দৃষ্টি স্থূলকে অতিক্রম করে' অনায়াসে এ সৃষ্টির রহস্যের অভ্যন্তরে যাতায়াত করতে পারে—যাঁদের বাহিরের দেখার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের দেখাও খুলেছে—যাঁরা চর্ম্মচক্ষুতেও দিব্যি দেখতে পান—আবার যাঁদের দিব্যচক্ষুরও অভাব নেই।

এর মধ্যে প্রথম রকমের লোকেরা—স্থূল দৃষ্টির লোকেরা বলবেন যে—মানুষ কর্ম্ম করে—সে ত স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি একটা কিছু লাভ করবার জন্যে। কেউ বা অর্থ, কেউ বা যশঃ খ্যাতি কেউ বা সম্মান কেউ বা আর একটা কিছু লাভ করবার জন্যে কর্ম্ম করছেন। এই অর্থ যশঃ মান ইত্যাদিই হচ্ছে কর্ম্ম করবার কারণ। কর্ম্ম করবার এইটে যদি কারণ বলে' মানা যায় তবে ভোগ না করবার কোন মানে হয় না। অর্থ যশঃ মান ইত্যাদি লাভের জন্য কর্ম্ম করে' যখন সেগুলি লাভ হ'ল তখন সেগুলিকে যদি ভোগ না করা যায় তবে কর্ম্ম করবার যুক্তিও লোপ পায়। কবি যদি খ্যাতির জন্য কাব্য লেখেন, ঔপন্যাসিক যদি যশের জন্য উপন্যাস লেখেন, ব্যবসায়ী যদি অর্থের জন্য ব্যবসা করেন তবে সেগুলি তাঁদের প্রাপ্য হ'লে, তাঁরা ভোগ করবেন না কেন? যদি ভোগ না করেন তবে উপরিউক্ত কর্ম্মের কারণ অনুসারে কর্ম্ম করবার যুক্তিও লোপ পেয়ে যায়। যুক্তি-তর্কের বিচারের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য তাঁদের হয় বলতে হয়—"কর্ম্ম করব ভোগ করব"—নয় "কর্ম্মও করব না ভোগও করব না"। স্থূল দৃষ্টির লোকেরা কর্ম্মের যে কারণ নির্দ্দেশ করলেন সে কারণ অনুসারে

ভোগ ছাড়া কর্ম্মের কোন মানেই থাকে না। ভোগ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্ম সন্ন্যাসও আসে। এটা Logic সুতরাং তাঁদের "কর্ম্ম কর্‌ব ভোগ কর্‌ব না" এ সূত্রের কোন যুক্তি সঙ্গত মানে নেই।

কিন্তু ঐ যে দ্বিতীয় রকমের লোকের কথা বলেছি—যাঁদের দিব্যদৃষ্টি আছে, যাঁরা সৃষ্টির ভিতরের রহস্য জান্‌বার অধিকারী হয়েছেন—তাঁরা বল্‌বেন যে স্থূলদৃষ্টির লোকেরা কর্ম্মের যে কারণ নির্দ্দেশ কর্‌লেন তা কর্ম্মের কারণ cause নয়—তা প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মের ফল effect. সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ড যেমন বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় যুদ্ধের কারণ নয়—এমন কি কৈসরের, জার্ম্মাণজাতীর রাজ্যবিস্তারের বাণিজ্যবিস্তারের আকাঙ্খাও যেমন এ যুদ্ধের কারণ নয়—এ যুদ্ধের কারণ আরও গভীরে, আরও অন্তরে—বিশ্বমানবের হৃদয়-যবনিকার অন্তরালে—যেখানকার এক একটা পরিবর্ত্তনে দৃশ্যমান পৃথিবীতে এক একটা প্রকাণ্ড ওলট্ পালট্ হ'য়ে যায়—এ যুদ্ধের প্রকৃত কারণও গুপ্ত হ'য়ে আছে সেখানে। তেমনি মানুষেরও কর্ম্ম কর্‌বার যে কারণ—তা তা'র বাহিরে নেই, তা আছে তা'র আপনার মধ্যে—তা তা'র বাহিরে খুঁজ্‌লে হবে না—তা খুঁজ্‌তে হবে তা'র অন্তরে। মানুষের কর্ম্ম কর্‌বার আসল কারণ হচ্ছে তা'র স্নায়ুতে স্নায়ুতে পেশীতে পেশীতে যে ওজস্ রয়েছে—তা'র মনে মনে প্রাণে প্রাণে অন্তরে অন্তরে যে কর্ম্ম প্রেরণা রয়েছে—তা'র প্রকৃতিতে যে চিৎ রয়েছে—তাই। এই যে ওজস্, এই যে কর্ম্ম প্রেরণা এই যে চিৎ এরা ভগবানসিদ্ধ সুতরাং সৎ। আর সেই জন্যেই মানুষ কর্ম্ম কর্‌তে বাধ্য। কেবল যে

বাধ্য তাই নয়—এই কর্ম্ম করার মধ্যেই রয়েছে তা'র মুক্তি। কারণ সত্যের আশ্রয়েই মুক্তি। আর সত্যকে অস্বীকার কর্‌লেই দুঃখ ও অমঙ্গল। তাই মানুষ কর্ম্ম করেই আনন্দ পায় শান্তি পায় —কর্ম্ম না করে' নয়। ধনই বল মানই বল যশঃ খ্যাতি যা বল এ সমস্তই মানুষের জীবনে accident (গৌণ ঘটনামাত্র)। মানুষের কাছে এদের কোনই মূল্য থাক্‌ত না যদি না থাক্‌ত তা'র অন্তরে তা'র প্রকৃতিতে ঐ চিৎশক্তি। সুতরাং এই চিৎ এই কর্ম্ম-প্রেরণাই মানুষের কর্ম্ম কর্‌বার প্রকৃত কারণ—আর সেটা সৎ—ভগবানসিদ্ধ। সেই জন্যেই আমরা মানুষের কর্ম্ম কর্‌বার পক্ষপাতী। এই হচ্ছে দিব্যদৃষ্টির লোকদের কথা।

দিব্যদৃষ্টি লোকদের ঐ কথা যদি মানা যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে সত্যের খাতিরে এটাও মান্‌তে হবে যে মানুষের প্রবৃত্তিতে যেমন ভগবানসিদ্ধ কর্ম্মপ্রেরণা রয়েছে তেমনি তা'র মধ্যে ভোগের প্রেরণাও রয়েছে। আর এই ভোগের প্রেরণা যে সৎ ও ভগবানসিদ্ধ নয় তা অনুমান কর্‌বার কোন কারণ নেই। এরও প্রমাণ সমগ্র মানবজাতি। এটা যদি স্বীকার করা যায় তবে ঐ কর্ম্মপ্রেরণা আর ভোগের প্রেরণার মধ্যে একটাকে জীবনে বরণ করে' আর একটাকে ত্যাগ কর্‌ব কেন ? একটা সত্যের আশ্রয়ে যদি মানুষের মুক্তি, আনন্দ আসে তবে তা'র জীবনের আর একটা সত্যের আশ্রয়েও তা আস্‌বে—এটাই হচ্ছে ন্যায্য যুক্তির কথা। সুতরাং ভোগকে ত্যাগ কর্‌বার কি কারণ থাক্‌তে পারে ?

ভোগ করে' যে মানুষের আনন্দ হয় সেটা প্রত্যক্ষ সত্য। তবে

সে আনন্দকে জীবনে বরণ কর্‌ব না কেন? এমন সহজসাধ্য আনন্দকে জীবন থেকে সরিয়ে রাখ্‌ব কেন? এর উত্তরে ভোগের বিরোধীদল বল্‌বেন যে ভোগের যেটা আনন্দ সেটা আপাত—এর পশ্চাতে গুপ্ত হ'য়ে রয়েছে বিরাট অমঙ্গল। যে ভোগকে বরণ কর্‌বে অমঙ্গলকেও তা'র বরণ করে' নিতে হবে। এই কথাটাই আমরা মানি নে। যে-সৃষ্টি আনন্দ থেকে উৎপত্তি হ'য়ে আনন্দের ওপরে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে আছে সেই সৃষ্টির মধ্যে যে ভগবান একটা অমঙ্গলকে ঢুকিয়ে দিয়ে বসে' আছেন—এইটেই আমরা মান্‌তে পারি না। আসল কথা হচ্ছে এই যে—আগুনে দাহিকা শক্তি আছে। তা'তে রান্না করাও চলে আবার ঘর পুড়িয়ে দেওয়াও যায়। তাই বলে' যে আগুনটা অমঙ্গলের এ যিনি বল্‌বেন—আর যাই হ'ন—তিনি বুদ্ধিমানও নন্‌ জ্ঞানবানও নন্‌। ভোগ অমঙ্গল আনে তখন যখন সেটা হয় মিথ্যা ভোগ। মিথ্যা ভোগ হচ্ছে সেইটে যেটা মানুষের সামর্থ্যের বাহিরে। মানুষের সত্তাটা মিথ্যা দিয়ে ভরে' ওঠে সেই সময় যখন সে তা'র অন্তরের জীবনদেবতাকে খারিজ করে' দিয়ে তা'র মনে সে অহং-দেবতার আসন পাতে। আর অহং দেবতার যে মিথ্যা সেটা প্রবৃত্তির দিকেও হ'তে পারে, নিবৃত্তির দিকেও হ'তে পারে—ভোগেও হ'তে পারে, ত্যাগেও হ'তে পারে। সুতরাং যেদিক থেকে দেখা যাক্‌না কেন ভোগটাকে জীবন থেকে বাতিল করে' দেওয়ার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কেবল তা'ই নয় এই ভোগ ত্যাগটা সমস্ত সৃষ্টিতত্ত্বের বিরোধী কথা।

কারণ এই যে সৃষ্টি—এই সৃষ্টির raison d'etre (মূল কারণ) স্থাপিত হ'য়ে রয়েছে ভোগের ওপর। কি ভোগ? না, আনন্দ ভোগ। কিসের আনন্দ? না, বিভিন্ন বিভিন্ন রসের আনন্দ। নইলে সৃষ্টির কোন মানে থাকে না। কারণ ভগবান যখন এক ছিলেন—যখন তিনি বহু হন নি তখন ত তিনি নিরানন্দ ছিলেন না। তবুও তিনি বহু হলেন। কেন? তাঁর ইচ্ছা। এর ওপরে আর কোন কথা নেই। ভগবান যখন এক ছিলেন আর যখন তিনি বহু হলেন—এই দুই অবস্থার আনন্দে তফাৎ কি? একটা হচ্ছে সিন্ধুর অতল তলের আনন্দ; আর একটা হচ্ছে স্রোতস্বিনীর গতিভঙ্গের আনন্দ। একটা স্থিতির আনন্দ, আর একটা গতির আনন্দ—একটা স্থাণুর আনন্দ, আর একটা রেণুর আনন্দ—একটা অদ্বৈতের আনন্দ, আর একটা দ্বৈতের আনন্দ—একটা বৈদান্তিকের আনন্দ, আর একটা তান্ত্রিকের আনন্দ। একটায় বিভিন্ন বিভিন্ন রসের সমাপ্তি, আর একটায় সর্ব্বপ্রকার রসের পরিণতি। সর্ব্বপ্রকার রসের—তা সে খাদ্যরসই হোক্ অথবা কাব্য রসই হোক্।

সুতরাং যাঁরা সৃষ্টিকে মানেন—ভগবান যে বহু হয়েছেন সেটা স্বীকার করেন অর্থাৎ যাঁরা মায়াবাদী নন্ তাদের পক্ষে ভোগের বিরোধী হওয়া অত্যন্ত যুক্তিহীন—illogical.

সন্ন্যাসীর কথা

সন্ন্যাসী সংসারের একটা মস্ত দায়িত্ব। কারণ সন্ন্যাসীর নিজের কোন উপার্জ্জন নেই অথচ তা'কে খেতে হবে। সুতরাং তাদেকে খেতে দেওয়ার ভার পড়ে সংসারের লোকের ওপর। সমাজ অবশ্য ভিখারীকেও প্রতিপালন করে' আস্‌ছে কিন্তু এই সন্ন্যাসীকে দেওয়া আর ভিখারীকে দেওয়ার মধ্যে একটা মস্ত প্রভেদ আছে। সমাজ ভিখারীকে যা দেয় তা দয়া করে করুণা করে' তাঁকে ছোট জেনে' কিন্তু সন্ন্যাসীকে যা দিতে হবে তা সন্ন্যাসীর ন্যায্য পাওনা-স্বরূপে—কেবল তা'ই নয় সঙ্গে সঙ্গে এটাও মান্‌তে হবে যে সন্ন্যাসী বড়—তাঁকে শ্রদ্ধা কর্‌তে হবে, ভক্তি কর্‌তে হবে, সম্ভ্রম দেখাতে হবে। কাজে কাজেই এতে সমাজের অর্থের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক দিকটারও একটা টান পড়্‌ছে। সুতরাং এটা খুবই স্বাভাবিক যে সমাজ একদিন বুঝ্‌তে চাইবে যে এই যে সন্ন্যাসীকে আমরা প্রতিপালন কর্‌ছি সে সন্ন্যাসীদের দ্বারায় সমাজের কি উপকার হচ্ছে।

কারণ যে কেউ হোক্ না কেন সে যদি সমাজের কাছে কিছু দাবী করে তবে আগে প্রমাণ কর্‌তে হবে তা'র শূদ্রত্ব—সে

সমাজের কি ভাবে সেবা কর্‌ছে—সমাজের সে কি কাজে লাগ্‌ছে —সমাজের কি উপকার সে সাধন কর্‌ছে—তা'র দাবীও নির্ভর কর্‌বে এর ওপর। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য—এদের সবার মূল কথাটা হচ্ছে শূদ্রত্ব। এই হিসেবে শূদ্র বড়। যেখানে এই শূদ্রত্বকে আশ্রয় করে' ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য গড়ে' ওঠে নি সেখানে তাদের ধ্বংস অনিবার্য্য। এমন কি বাহুবলে বলীয়ান যে রাজশক্তি তা'রও পতন নিশ্চয়। ফ্রান্সের রাজা চতুর্দ্দশ লুই যে বলেছিল L'état c'est moi—I am the state, এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ বাণীর প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হ'ল ষোড়শ লুই ও মারি আন্‌তোয়ানেৎ‌কে তাদের নিজ নিজ মাথা দিয়ে—আর তা'র গৌণ ফল হ'ল যে ফ্রান্স থেকে ধীরে ধীরে রাজ-সিংহাসন পর্য্যন্ত উঠে গেল। এটা সৃষ্টি-তন্ত্রের অনিবার্য্য নিয়ম। যেটা অকেজো যেটা অমঙ্গলকেই টেনে আন্‌ছে সেটা একদিন না একদিন খসে' যাবেই। সুতরাং সমাজের বুকের ওপর এই যে সন্ন্যাসীর সিংহাসন তা বজায় থাক্‌বে কি না তা নির্ভর কর্‌বে এর ওপরে যে, সন্ন্যাসী যাঁরা তাঁরা সমাজের কোন উপকার কর্‌ছেন অথবা তাঁদের দ্বারা সমাজের কোন অমঙ্গলই হচ্ছে। এ সম্বন্ধে সন্ন্যাসীর দায়ীত্ব খুব বেশী। কারণ সন্ন্যাসীর দ্বারা যে মঙ্গল বা অমঙ্গল হয় তা একেবারে সমাজের মূল থেকে আরম্ভ হয়। সন্ন্যাসী আপনার যে প্রভাব বিস্তার করেন তা সমাজের মনে মনে। এই জন্যই সন্ন্যাসীর ইষ্ট অনিষ্ট কর্‌বার ক্ষমতা বেশী। সমাজ কোন সমাজের লোকের দ্বারা অনিষ্টের ধার না ধার্‌তে পারে কিন্তু সন্ন্যাসীর দ্বারা যে অনিষ্ট

তা'র বিরুদ্ধে সে খড়্গহস্ত হ'য়ে উঠ্‌বেই। কারণ সমাজের লোকের দ্বারা যে অনিষ্ট সেটা কাঁচা অনিষ্ট কিন্তু সন্ন্যাসীর দ্বারা যে অনিষ্ট সেটা একেবারে পাকা অনিষ্ট। সে অনিষ্টের মোটা মোটা শিকড় এম্‌নি করে' সমাজের মন প্রাণকে জড়িয়ে ধরে যে তা'তে তাদের আর নড়্‌বার চড়্‌বার শক্তি থাকে না। কারণ চিন্তার রাজ্যে প্রকৃত সন্ন্যাসী যাঁরা তাঁরা সাধারণ লোকের চাইতে শক্তিমান। আর জগৎটা যে Thought currentএর দ্বারাই চালিত হচ্ছে এ সত্যটা পাশ্চাত্যও মেনে থাকেন।

সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে আমাদের এত কথা বল্‌বার উদ্দেশ্য এই যে আমাদের মনে হয় এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের দ্বারা আমাদের সমাজের একটা অমঙ্গল হ'য়ে এসেছে। কেমন করে'—সেইটেই আমরা এই প্রবন্ধে দেখ্‌তে চেষ্টা কর্‌ব। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন কথা বল্‌বার আগে মানুষ সম্বন্ধে আমাদের কি ধারণা সেইটে আমরা স্পষ্ট করে' বল্‌তে চেষ্টা কর্‌ব।

ভগবানের প্রতি আমাদের ভক্তি প্রেম না থাক্‌তে পারে কিন্তু তাঁর প্রতি আমাদের বিশ্বাস আছে অগাধ। তিনি যখন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তখন আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে তিনি তাহা ঠিকই সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ ইংরাজীতে যাকে বলে He meant it—সে-সম্বন্ধে তিনি কোন জাল জুয়োচুরি করেন নি অথবা ঘি-বিক্রেতার মত তা'তে কোন ভেজাল মেশান নি। তাঁর সমস্ত সৃষ্টি সম্বন্ধে আমাদের এই একই বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের দ্বারা

চালিত হ'য়ে মানুষকে আমরা কেমন বুঝেছি সেইটে আগে বল্‌ব।

মানুষের দেখ্‌তে পাচ্ছি আমরা ছ'দিকে টান। একটা সান্তের দিকে, একটা অনন্তের দিকে। তা'র জ্ঞাতিত্ব পৃথিবীর সঙ্গেও যেমন, আকাশের সঙ্গেও তেমনি। পৃথিবীর দিকে তা'র সত্যিকার টান আছে বলে'—কর্ম্মে কর্ম্মে সে পৃথিবীর বুকে আপনার অস্তিত্ব ফুটিয়ে তুলেছে, আপনার চিহ্ন যেখানে যেখানে পেরেছে সে পৃথিবীর পায়ে পায়ে এঁকে রাখ্‌তে চেষ্টা কর্‌ছে। পৃথিবীর পানে মানুষের এই যে টান সেটা ভালবাসার টান—আর ভালবাসা যেখানে আছে সেখানে আনন্দ আছেই—আর যেখানে আনন্দ আছে সেখানে অমঙ্গল নেই কিছুতেই। আবার অন্যদিকে আকাশের সঙ্গেও মানুষের সত্যিকার টান আছে। গাছ যেমন মাটীতে শিকড় গেড়ে' আপনাকে আকাশে ছড়িয়ে দেয়, মানুষও তেমনি। মানুষ যে গান করে, কবি যে ছন্দে ছন্দে আপনার হৃদয়ের রাগিণী ব্যক্ত করে, শিল্পী যে ছবি আঁকে, ভাস্কর যে পাষাণ কেটে কেটে তা'র রেখায় রেখায় কোন্ অজ্ঞাত লোকের সুষমা ফুটিয়ে তোলে—এ সবই শুধু আকাশে আকাশে দূর দিগন্তের কোলে কোলে যেখান থেকে কত রাত-জাগা অপ্সরীর পায়ের নূপুরের রিণি ঝিনি গুঞ্জন তাদের মর্ম্মে এসে পৌঁছাচ্ছে সেখানে সেখানে তাদের আপনাকে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াস মাত্র। শরতের পূর্ণিমা রাতে যখন জোছনায় জগৎটা ছেয়ে যায় আকাশটা ভেসে যায় তখন যে মানুষের মনে মনে প্রাণে প্রাণে একটা কেমন-যেন-

কি ভাব জেগে ওঠে সেটা সেই অনন্তের টান—বর্ষায় যখন কাল কাল মেঘেদের মাথায় মাথায় ঝিলিক্ লাগে আকাশের কোলে কোলে গুর্ গুর্ দুর্ দুর্ ডাক ওঠে তখন যে মানুষের অন্তরে অন্তরে কোন্ অচিনপুরীর স্বপ্ন জেগে ওঠে সে-ও সেই অনন্তের টান। এই সান্ত আর অনন্ত নিয়েই মানুষ মানুষ।

কিন্তু সন্ন্যাসী সম্প্রদায়েরা মানুষের এই সান্তের দিকটা মানুষকে অবজ্ঞা কর্‌বার জন্য বরাবর উপদেশ করে' এসেছেন এবং সমাজের মনে মনে এম্‌নি করে' এই ভাবটা বিছিয়ে দিয়েছেন যে আমরা সবাই কম বেশী সংসার সম্বন্ধে উদাসীনতার খোলস পরে' কাল কাটিয়ে এসেছি। এই সান্তের দিকটা তাচ্ছিল্য কর্‌লে মানুষের ধর্ম্মের একপদ ভগ্ন করা হবে—আর একপদ ভগ্ন হ'লে অপর পদও বড় বিশেষ কার্য্যকরী হবে না। বাস্তবিকপক্ষে আমাদের দেশে বেদ উপনিষৎ লেখা হয়েছিল কোন্ যুগে? সেই যুগে যখন সন্ন্যাসীর গৈরিক পতাকার যাদুকরী মায়া সমাজের মনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে নি। ব্যাস বশিষ্ঠ ঋষি ছিলেন—সন্ন্যাসী ছিলেন না। একদিকে ইন্দ্রপ্রস্থ হস্তিনাপুর ছিল বলে' অপর দিকে নৈমিষারণ্যে ঋষিদের কণ্ঠে বেদমন্ত্র স্বচ্ছন্দ সহজ ও সত্য হ'য়ে উঠেছিল। আর তাঁদের তুলনায় কি চিন্তায় কি দার্শনিকতায় কি আধ্যাত্মিকতায় আজকার আমরা কি? হিমাদ্রির পাশে বল্মীক—অকূল সিন্ধুর তুলনায় নগণ্য বারিবিন্দু। আমরা যে আজ আধ্যাত্মিকতা আধ্যাত্মিকতা করে' বড়াই করি সে আধ্যাত্মিকতা প্রকৃতপক্ষে সমাজের মনে নেই আছে সেই প্রাচীন কালের লেখা

গ্রন্থে। তাই আজ আমাদের সমাজ শাস্ত্রধর হ'য়েই আছে—আপনার দেবতার সাক্ষাৎ সে পায় নি। সুতরাং আমাদের অনেকের এই যে ধারণা যে আমরা ইহলোকের ঐশ্বর্য্য গৌরব যশঃ মান ইত্যাদি বিসর্জ্জন দিয়ে আধ্যাত্মিকতার দিকটায় একটা মস্ত রকম লাভ লুটে নিয়েছি সেটা আমাদের হীনবল জাতীয় জীবনের মনের কাছে যেমনি আরামদায়ক তেমনি মিথ্যা। এ সম্বন্ধে যদি কেউ তর্ক তুল্‌তে চান তবে তাঁকে আজকার হিন্দুজাতির সঙ্গে রামায়ণ মহাভারতের যুগের আর্য্যগণের তুলনা করে' দেখ্‌তে বলি। —কা'রা বেশী সুন্দর সত্যময় আনন্দপূর্ণ—তাঁরা না আমরা। সেই যুগের মানুষের কৃত জিনিষ পত্তর নিয়েই আজ আমরা বড়াই কর্‌ছি—এ জগতে কিঞ্চিৎ জান মান বাঁচিয়ে আজও বেঁচে আছি। অথচ তাঁরা সবাই ছিলেন পূর্ণ কর্ম্মী পূর্ণ ভোগী। মানুষের কোন ধর্ম্মকেই তাঁরা ছেঁটে ফেলেন নি। তাঁরাই ছিলেন প্রকৃত মানুষ ঈশ্বরের বিভূতি—যাকে ভগবান made in His own image. এ জগতে অমৃতের সন্ধান পেয়েছিলেন তাঁরাই। তাঁরা শক্তিমান্ ছিলেন তাই শ্রীমান্ ছিলেন। আমরা এ জগতে সন্ধান পেয়েছি শুধু পাপের। তাই আমরা ভীষণ রকম শুচিবাতিকগ্রস্ত হ'য়ে এ সৃষ্টির যেখানে যেখানে সম্ভব হয়েছে সেখানে সেখানে বড় বড় লাল অক্ষরে Censor নামাঙ্কিত টিকিট মেরে' দিয়ে দিব্বি নিশ্চিন্ত মনে ব্যাকরণের সূত্র মুখস্ত কর্‌তে কর্‌তে জিহ্বা ক্ষয় কর্‌ছি। নহুষ কার্ত্তবীর্য্যের শক্তি আমাদের নেই, ব্যাস বাল্মীকি বশিষ্ঠ গৌতমের জ্ঞান আমাদের নেই, ইন্দ্রপ্রস্থ হস্তিনাপুরী অযোধ্যার সম্পদ

আমাদের নেই। অথচ যখন বীর্য্য ঐশ্বর্য্য জ্ঞান ছিল তখন এরা সব এক সঙ্গেই ছিল। আর আজকার আমরা আমাদেকে দেখে কে বল্‌বে যে আমরা সেই উন্নতশির, প্রশস্তললাট, গৌরবর্ণ, বিশালবক্ষ, দীর্ঘবাহু, নির্ভীকহৃদয় আর্য্যের বংশধর—আজকার আমরা হচ্ছি বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের বটতলার এডিসন। স্পষ্ট কথা আমরা শিবত্ব লাভ করি নি—আমরা লাভ করেছি ক্লীবত্ব।

প্রত্যক্ষের চাইতে বড় প্রমাণ আর কিছু নেই। আজকার বাঙ্গালার নরনারীর অন্তরের দরজায় ঘা দিয়ে দেখ্‌লে স্পষ্ট বোঝা যাবে যে সেখান থেকে আনন্দের কলধ্বনি ফুট্‌ছে না হাহাকার উঠ্‌ছে। আসলকথা আমরা আজ এ জগতে ঐশ্বর্য্য গৌরব যশঃ মান হারিয়ে বসে' আছি কিন্তু তা'র ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে বড় রকম লাভ কিছুই হয় নি—কিছু মাত্র লাভ হয়েছে কি না সেটাও তর্কের বিষয়। আর আমাদের এই যে অবস্থা তা'র জন্য দায়ী অনেকখানি সেই গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় যাঁরা সমাজের নরনারীর কাণে কাণে বলে' বেড়িয়েছেন "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা" "সংসার মায়া" ইত্যাদি ইত্যাদি। এই শিক্ষাকে আশ্রয় করে' আমাদের দেশবাসী হারিয়েছে পুরুষকার—সে অমঙ্গলকে আশ্রয় করে' সমাজে মাথা তুলেছে দারিদ্র্য—দারিদ্র্যের সহবাসে আমাদের মন প্রাণ সব হ'য়ে গেছে সঙ্কীর্ণ ও নীচ—দীন হীন প্রাণ নিয়ে আজ আমরা শক্তিহীন আনন্দহীন। জগতে আমরা কোন কাজ দেখি না—সৃষ্টিতে কোন সুখ পাই না

—এ বিশ্বমানবের মহামেলায় আমাদের কোন সহানুভূতি নেই—সেখানে আমাদের কিছু বল্‌বার নেই, কর্‌বার নেই, কিছু শিখ্‌বার নেই, শিখাবার নেই। এর চাইতে বড় অধর্ম্ম মানুষের আর নেই।

এই যে শিক্ষা—এই যে অমঙ্গল—যা আমাদের সমাজকে কোন আনন্দলোকে নিয়ে যাই নি—অথচ সমস্ত জগতের অবজ্ঞা পাবার অধিকারী করে' তুলেছে—তা'র বিরুদ্ধে সমাজ-দেহ থেকে একটা সংগ্রাম উঠ্‌তে বাধ্য। কারণ জীবদেহে কোন অমঙ্গল চিরদিন বাসা বেঁধে থাক্‌তে পারে না। সে অমঙ্গল একদিন না একদিন ধরা পড়্‌বেই। আর একবার ধরা পড়্‌লে সে অমঙ্গলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষিত হবেই। সে সংগ্রাম ঘোষিত হবে সেই-দিন যেদিন সমাজ গতানুগতিকের দাসত্ব ছেড়ে' আপনার জন্য আপনি চিন্তা কর্‌তে শিখ্‌বে—যেদিন সমাজ প্রাণবন্ত হবে—সজাগ হ'য়ে উঠে বস্‌বে। সুতরাং সন্ন্যাসী যদি এখন সময় থাক্‌তে থাক্‌তে আপনার সংস্কার না করেন, তিনি নিজ প্রকৃতির দ্বারা চালিত হ'য়ে নিজে যে পথই অবলম্বনই করুন না কেন—তিনি যদি সৃষ্টি সম্বন্ধে তাঁর doctrineএর পরিবর্ত্তন না করেন—সমাজের atmosphereএ বিভিন্ন প্রকারের, বর্ত্তমান সময়ের সঙ্গে খাপ-খাওয়ান চিন্তারাশী ঢেলে না দেন—মানুষের মধ্যে যা'তে করে' পুরুষকার উৎসাহ উদ্যম প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশী উদ্বুদ্ধ হয় তা'র সাহায্য না করেন; তবে এমন একদিন খুব দূর বলে' মনে হয় না, যখন সন্ন্যাসীর সিংহাসনখানি সমাজের বুক থেকে ধীরে ধীরে চ্যুত

হ'য়ে পড়্‌বে। কারণ আমাদের মনে হয় এই সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম সমাজের অন্তরে অন্তরে কিছুদিন থেকে আরম্ভ হ'য়ে গেছে। আর আমাদের ধারণা যে সে সংগ্রামের ভিত্তি স্থাপন করে' গেছেন আপনার অজ্ঞাতসারে বিবেকানন্দ। কারণ মানুষের মুখের কথার চাইতে মনের কথা বড়—মানুষের পরণের কাপড়ের রঙের চাইতে অন্তরের রঙ বেশী গাঢ়।

মানুষের কথা

রোগীকে স্বাস্থ্যবান্ করিতে হইলে রোগীর রোগের মূল অনুসন্ধান প্রয়োজন, দুঃখের নিরাকরণ করিতে হইলে দুঃখের কারণসমূহ পরিজ্ঞাত হওয়া দরকার, সেইরূপ দেশের উন্নতিসাধন করিতে হইলে দেশের অবনতির মূল কারণ অনুসন্ধান ও আবিষ্কার নিতান্ত আবশ্যক, তাহা না হইলে আমরা ভুলপথে আমাদিগের শক্তিকে পরিচালিত করিয়া বৃথা কালক্ষয় ও শক্তির অপব্যয় করিতে পারি।

দেশের অবনতির কারণ সম্বন্ধে আজকাল অনেকের মুখেই একটা খামখেয়ালী খোস্‌মেজাজী কথা শুনিতে পাওয়া যায়, সেটা হইতেছে এই যে—দেশের অবনতি হইয়াছে কারণ আমাদের ধর্ম্মের অবনতি হইয়াছে। এই কথাটা অনেকস্থলেই শোনা গেলেও ইহার ব্যাখ্যা কিন্তু কোথাও শ্রুতিগোচর হয় না। যাঁহারা এ কথাটা বলেন তাঁহারা যে ধর্ম্মের অবনতি অর্থে কি বলিতে চাহেন অথবা তাঁহাদেরই ইহার কোন স্পষ্ট অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে কি না তাহা পরিষ্কারভাবে এ পর্য্যন্ত কেহই বলেন নাই। সুতরাং ধর্ম্মের অবনতিটা মানিয়া লইলেও এ পর্য্যন্ত আমরা কোন পন্থা আবিষ্কার করিতে পারি নাই। যাহা অবলম্বন করিয়া আমরা

ধর্ম্মের অবনতিরূপ অমঙ্গল হইতে অব্যাহতি পাইয়া দেশের এবং জাতির উন্নতি ও মঙ্গল সাধন করিতে পারি। সেদিন এক অশীতিপর প্রাচীন ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ঠাকুর, আমাদের ত ধর্ম্মের অবনতি হইয়াছে—কথাটার অর্থ কি বলিতে পারেন?" বৃদ্ধ উত্তর করিলেন—"বাপু হে ধর্ম্মের অবনতি ত হইয়াছেই সে ত স্পষ্ট। আজকালকার লোকের কি আর ব্রাহ্মণের প্রতি তেমন শ্রদ্ধা ভক্তি আছে?" ইহাই হইল প্রাচীন ব্রাহ্মণের ধর্ম্মের অবনতির ব্যাখ্যা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণও যে এখন নাই তাহা বৃদ্ধ ভাবিয়া দেখেন নাই। তাঁহার ধারণা ব্রাহ্মণগণ যেমন ছিলেন তেমনই আছেন। কিন্তু সে ক্ষান্ত দান্ত জিতক্রোধ জিতমন ব্রাহ্মণ ত এখন নাই বলিলেই হয়। এখন আছে শুধু উপবীত-ধারী ব্রাহ্মণ। সুতরাং যাঁহারা কিছুমাত্র চিন্তাশীল, যাঁহাদের কিছুমাত্র আত্মসম্মান জ্ঞান আছে—তাঁহারা যে এই উপবীতধারী ব্রাহ্মণগণের নিকট আপনাদের মস্তক নত করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন তাহাও অত্যন্ত স্বাভাবিক। যে শ্রদ্ধা ভক্তিতে বীরতুল্য ব্রাহ্মণের অধিকার, উপবীত সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণকে সে ভক্তি শ্রদ্ধার পাত্র করাই বরং অধর্ম্ম। কারণ সত্যের উদ্‌যাপনই ধর্ম্ম এবং অসত্যের আশ্রয়ই অধর্ম্ম। সুতরাং বর্ত্তমানে এই যে ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার অভাব তাহা ত অধর্ম্ম নহে। ব্রাহ্মণকে যে-কারণে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতাম সে কারণের অভাব হইয়াছে সুতরাং ভক্তি শ্রদ্ধারও অভাব হইয়াছে। ইহাই স্বাভাবিক, ইহাই সত্য, ইহাই ধর্ম্ম। সুতরাং ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের

অভাবে যে দেশের অবনতি হইয়াছে তাহা মানিয়া লওয়া অযৌক্তিক।

অন্য এক দিন এক গোস্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"গোঁসাইজী, আমাদের ত ধর্ম্মের অবনতি হইয়াছে। এ কথাটার ব্যাখ্যা কি বলিতে পারেন?" তিনি উত্তর করিলেন—"অধঃপতনের আর বাকী কি? আজকাল যে মুর্গি মটনের শ্রাদ্ধ"। সুতরাং গোস্বামীজির ধর্ম্মের অবনতির যে ব্যাখ্যা সেটা রন্ধনশালার বিরুদ্ধে অভিযোগ। কিন্তু এই 'মুর্গি মটনটা' ত শুধুই রসনার রুচিভেদের একটা কথা। ইহার সহিত একটা দেশের কিম্বা জাতির উন্নতি কি অবনতির কোন সম্বন্ধ আছে কি না তাহা গোঁস্বামীজী ভাবিয়া দেখিবার অবসর পান নাই অথবা প্রয়োজন বিবেচনা করেন নাই। 'মুর্গি মটন' সমাজিক আচার ব্যবহারের বিরুদ্ধ হইতে পারে—কিন্তু আচারের পরিবর্ত্তন হইলেই যে একটা দেশের অধঃপতন বা একটা জাতির মৃত্যু নিশ্চয় তাহা কোন্ চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিবেন। সুতরাং গোস্বামীজির এই 'মুর্গি মটনেই' যে দেশটা অধঃপাতে গিয়াছে তাহাও মানিয়া লওয়া কঠিন।

কিন্তু তথাপি আমাদের যে অধঃপতন হইয়াছে তাহাও ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমরা ত চিরকাল এরূপ ছিলাম না। এমন দিন ছিল যখন আমরাও ধরাপৃষ্ঠে গৌরবোন্নত শিরে বিচরণ করিতাম। তখন এই বিশ্বমানবের মহামেলায় আমাদের চক্ষে কাতর দৃষ্টি ফুটিয়া অপরের করুণা ও অবজ্ঞা উদ্রেক করিত

না। তখন চিত্ত ছিল কুণ্ঠাহীন, হৃদয় ছিল উদার, জীবন ছিল খেলিবার সামগ্রী। সে সব আর নাই। কেন? এ অধঃপতনের কারণ কি? আমরা কোন্ ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছি যে আমাদের আজ এ অবস্থা? ইহার একই উত্তর—সে উত্তর হইতেছে এই যে—আমরা মানুষনামক জীবটীকে অস্বীকার করিয়াছি—তাহাকে অবজ্ঞা করিয়াছি। আমরা মনুষ্য-ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিয়াছি। আমরা এই কথাটাই বুঝিতে চেষ্টা করিব।

প্রথমতঃ ধর্ম্ম কি? ধর্ম্ম হইতেছে—সত্যম, ঋতম। যাহাকে আশ্রয় করিয়া এই সৃষ্টির প্রকাশ হইয়াছে, এই সৃষ্টির স্থিতি সম্ভব হইয়াছে, যাহাকে স্বীকার করিয়া বহু আপন আপন স্বাতন্ত্র্য লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, যাহাকে আশ্রয় করিয়া মানুষের মনুষ্যত্ব, বিড়ালের বিড়ালত্ব, বৃক্ষের বৃক্ষত্ব। আবার যাহার প্রেরণায় ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বৈশ্য, শূদ্র শূদ্র। মানুষ, বিড়াল, বৃক্ষ সকলেই এক—সকলেই সেই এক পরমাত্মার বিভূতি। আবার ইহারা সকলেই স্বতন্ত্র। ইহাদের স্বাতন্ত্র্য আসিল কোথা হইতে? ইহাদের পৃথক পৃথক গুণ হইতে। এই গুণের জন্ম হইল কি করিয়া? ইহাদের স্ব স্ব ধর্ম্ম হইতে।

সুতরাং এই সৃষ্টির যে ব্যষ্টির ব্যষ্টিত্ব—বহুর যে অনন্ত গুণের খেলা তাহার ভিত্তি হইতেছে বহুর আপন আপন ধর্ম্ম। আর এই ধর্ম্মের উদ্‌যাপনেই সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, মুক্তি, আনন্দ। কারণ এই যে ধর্ম্ম—তাহা কাহারও মনগড়া নয়। ইহা উদ্ভূত হইতেছে ব্রহ্ম

হইতে, সৎরূপ লইয়া—আনন্দ হইতে, অমৃতবহ হইয়া—লীলার জন্য।

সুতরাং মানুষের যে ধর্ম্ম, মানুষের যে মনুষ্যত্ব তাহা রহিয়াছে তাহার দেহের মধ্যে, মনের মধ্যে, চিত্তের মধ্যে, বুদ্ধির মধ্যে, বিজ্ঞানের মধ্যে—ইহাদের প্রেরণার মধ্যে। মানুষের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, উন্নতি, গৌরব, সৌষ্ঠব রহিয়াছে তাহার এই বহিরিন্দ্রিয়, অন্তরিন্দ্রিয়, অতীন্দ্রিয়—সকলের আপন আপন ধর্ম্ম উদ্‌যাপনের মধ্যে—কর্ম্মের মধ্যে, ভোগের মধ্যে, ইহাদের মুক্ত এবং সত্যচালনার মধ্যে রহিয়াছে তাহার আনন্দলোক—অমৃতত্ব। যেখানে ইহার ব্যতিক্রম সেখানেই মানুষের ধ্বংস মানুষের যাহা লইয়া মানুষ তাহার নাশ। যেখানেই ইহাদের অসত্য চালনা—সেখানেই মানুষের দুঃখ অমঙ্গল। কারণ ধর্ম্মই জীবকে ধারণা করিয়া আছে—এ সৃষ্টিকে সংরক্ষণ করিয়া আছে। এই কথাটা আমরা একটা উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

বৃহৎ উদ্যানবাটীকা। অসংখ্য গোলাপ বৃক্ষ। পত্রে পত্রে শাখা প্রশাখা আচ্ছাদিত। রক্ত শুভ্র পীত নানা বর্ণের গোলাপে বৃক্ষরাজি উজ্জ্বল—চারিদিক সৌরভে আমোদিত। সৌন্দর্য্যে, সুবাসে, ভঙ্গিমায়, রঙ্গিমায় উদ্যান-বাটিকা নন্দন-কানন সদৃশ। জ্ঞানীগণ কি বলিবেন? বলিবেন—ব্রহ্ম গোলাপবৃক্ষরূপে সৌন্দর্য্য ও আনন্দ বিস্তার করিতেছেন। কিন্তু গোলাপবৃক্ষ যদি বলিয়া বসে—"আমি বুঝিতেছি আমার মূল হইতে একটি শক্তি বিচ্ছুরিত হইতেছে—আর সে-শক্তি আপনাকে সার্থক করিতেছে মৃত্তিকা

হইতে রস টানিয়া—তাই আমার শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইতেছে, নব কিশলয় বিকশিত হইতেছে, পুষ্পরাজি ফুটিয়া উঠিতেছে, তাই সৌন্দর্য্যের প্রকাশ হইতেছে, সৌরভের বিকাশ হইতেছে। কিন্তু এ খেলা আর আমার ভাল লাগে না। আমি যোগশক্তি প্রভাবে যে-শক্তি মূলকে রস টানাইতেছে সে-শক্তিকে দমন করিব।" তবে গোলাপ বৃক্ষের আর যে-কোন উদ্দেশ্য সফল হউক বা না হউক—তাহার গোলাপ বৃক্ষত্বের অধঃপতন অনিবার্য্য। তাহার সে সৌন্দর্য্য, সৌরভ, গৌরবের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী, এবং পুষ্পরাজ্যে তাহার মান, পদ ও সম্ভ্রমের হানি নিশ্চয়।

আমাদের এ জাতিটাও কয়েক শতাব্দী হইল গোলাপ বৃক্ষের ঐ কথাটা বলিয়া আসিবার এবং কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। জীবনে উদ্দাম শক্তির অনুভব করিতেছি —মনে হইতেছে সে শক্তির বলে অশান্ত সিন্ধুকে তাড়িত মথিত করিয়া আপনার আজ্ঞাবহ করিতে পারি। কিন্তু খবরদার—সে শক্তিকে সার্থক হইতে দিও না। মনে অনন্ত কল্পনার খেলা দেখিতেছি, প্রাণে বিরাট ভোগ সামর্থ্যের আভাস পাইতেছি; বুদ্ধিতে আশ্চর্য্যরূপ নব নব উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাইতেছি, বিজ্ঞানে ধীর প্রতিভার, জ্ঞানের, আলোকের সন্ধান পাইতেছি, কিন্তু না উহাদিগকে আপন আপন ধর্ম্মের আচরণ করিতে দিও না। উহাদিগকে চাপাইয়া দাও, দমাইয়া দাও, পিষিয়া দাও। উহারা যেন তোমাকে কর্ম্মশীল করিয়া না তুলিতে পারে—তোমাকে ভোগবান্ করিয়া না ফেলিতে পারে—এ সৃষ্টিরূপ পদ্ম হইতে

আনন্দরূপ মধু যেন তুমি না আহরণ করিতে পার। কিন্তু কেন? এই যে আমার হস্ত পদ দেহ, মন প্রাণ বুদ্ধি চিত্ত—ইহাদিগকে উপবাসী করিয়া হত্যা করিবার ব্যবস্থা কেন? কোন্ উপকার সাধনের জন্য? কেহ বলিতেছেন ইহাদের উচ্ছেদ করিতে হইবে—কারণ ইহারা থাকিলে ভগবানে পৌঁছান যায় না—অন্ততঃ দুরূহ। আবার কেহ কেহ বলিতেছেন—এই যে দৃশ্যমান জগৎ তাহা মায়ামাত্র, স্বপ্ন, অলীক; এবং তোমার কর্ম্ম ও ভোগ স্বপ্নঘোরে হাত পা ছোড়ার মতই হাস্যজনক। আমরা এ সম্বন্ধে এ স্থলে কোন আলোচনা করিব না। কিন্তু ইহা মায়া হউক বা না হউক—মানুষের মনুষ্যত্বকে বিজয়ে মণ্ডিত করিতে হইলে—গৌরবে দীপ্ত করিতে হইলে তাহার দেহ মন প্রাণ বুদ্ধি জ্ঞান বিজ্ঞানকে স্বীকার করিতে হইবে, গ্রহণ করিতে হইবে—কারণ ইহাদের লইয়াই মানুষ—মানুষ হইতে এই সকলকে খসাইয়া লইয়া যাহা থাকে তাহা ব্রহ্ম—নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, আনন্দময়—মানুষেও যাহা বিড়ালেও তাহা, বৃক্ষেও তাহাই। সুতরাং মানুষ নাম ও রূপধারী সৃষ্ট জীবটির সুখ সমৃদ্ধি গৌরব লব্ধ হইবে ইহাদের ভিতর দিয়া, ইহাদেরই স্ব স্ব ধর্ম্মের আচরণে। সুতরাং আমাদের জাতিটাকে উন্নত করিতে হইলে—ইহাকে সুখে সমৃদ্ধিতে, সম্মানে, গৌরবে মণ্ডিত করিতে হইলে—প্রত্যেক ব্যক্তিকে আলিঙ্গন করিতে হইবে—ঐ মনুষ্য ধর্ম্মকে—তাহার দেহ মন প্রাণ বুদ্ধি জ্ঞান বিজ্ঞানকে—তাহাদিগের উদ্বুদ্ধ শক্তিকে। মানুষের গৌরব রহিয়াছে এই সকলের মুক্ত খেলায়—তাহার

অমৃত রহিয়াছে এই সকলের সত্য চালনায়। তাহার এই সকল যন্ত্রের মুক্ত খেলা সহজেই হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের সত্য-চালনা করিতে হইলে চাই এই সৃষ্টিলীলার রহস্যভেদ—আর এই সৃষ্টিলীলার রহস্যভেদ করিতে হইলে চাই আপনার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয়। আর সে পরিচয় লাভের একমাত্র উপায় হইতেছে যোগ।

ব্রাহ্মণের কথা

সাধারণ মানুষ আর মহাপুরুষদের মধ্যে একটা প্রভেদ এই যে মহাপুরুষেরা যে সকল সত্য লোকসাধারণকে নির্দ্দেশ করে' দেন সে সকল সত্য প্রায়ই কম বেশী দেশাতীত—কালাতীত—সে সকল সত্যের মধ্যে একটা সার্ব্বজনীনতা বিশ্বজনীনতা লুকিয়ে থাকে—সুতরাং সে সকল সত্যের অর্থকে একটু গূঢ়ভাবে খুঁজে দেখ্‌তে হয়। আর সকল মহাপুরুষের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ—যাঁকে আমরা ভগবানের অবতার বলে' মানি—পূর্ণাবতার —ভগবান স্বয়ং। সুতরাং তিনি যখন বল্লেন যে—চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং—তখন যদি আমরা মনে করে' বসি যে এই চতুর্ব্বর্ণের অস্তিত্ব শুধু এই ভারতবর্ষেই আছে—শুধু হিন্দুদের মধ্যেই প্রকট —শুধু যারা "ওঁ ভূর্ভুবস্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং" বলে' গায়ত্রী জপ করে তাদের মধ্যেই এটা সত্য হ'য়ে আছে, তবে সেটা শুধু এই-ই জানিয়ে দেবে যে আমরা শ্রীকৃষ্ণকেও বুঝি নি তাঁর গীতাকেও বুঝি নি। আসল সত্য হচ্ছে এই যে, এই চতুর্ব্বর্ণ সকল দেশেই সকল সমাজেই সকল কালেই বিদ্যমান রয়েছে। ভগবানকে আমরা জানি বা না জানি—মানি বা না মানি—

কিন্তু ভগবান যেমন আছেনই—তেমনি আমরা এই চতুর্ব্বর্ণের প্রত্যেক বর্ণের একটা বিশেষ বিশেষ সীমা বা গণ্ডী প্রত্যেক সমাজে দেখ্‌তে পাই বা না পাই, তবু সব সমাজেই তা'রা বিদ্যমান হ'য়ে রয়েছে, নইলে সমাজ সুস্থ ও সুন্দর হ'য়ে মঙ্গলময় হ'য়ে থাক্‌তে পারে না। তাই ঠিক ঐ "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং" এর পরে পরেই আছে—"গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ"। সুতরাং এ কথা বল্‌লে ধৃষ্টতা প্রকাশ করা হবে না বোধ হয় যে—বাৎস্য কাশ্যপ ভরদ্বাজ ইত্যাদি মুনির বংশধর না হ'য়েও ব্রাহ্মণ হওয়া যায়—চন্দ্র ও সূর্য্য বংশের কুলাবতংশ না হ'লেও ক্ষত্রিয় হ'লে তা'কে ভগবানের এজলাসে জবাবদিহি কর্‌তে হয় না। ক্ষত্রিয়ের পরিচয় যেমন তা'র ক্ষাত্রধর্ম্মে, তা সে ধনুর্ব্বাণ নিয়েই যুদ্ধ করুক বা ম্যাক্সিম কামানের সঙ্গে অ্যাস্‌ফিক্সিয়েটিং গ্যাস জ্বালিয়েই যুদ্ধ করুক, তেমনি ব্রাহ্মণেরও পরিচয় হচ্ছে তা'র জ্ঞানে, তা সে সংস্কৃতেই কথা বলুক বা হিব্রু গ্রীক রাসিয়ান ইংরেজী ভাষাতেই চিন্তা করুক।

মানুষের তিনটী ভগবানসিদ্ধ ইচ্ছা আছে—যাকে ইংরেজিতে আমরা বলি instinct. এই তিনটি হচ্ছে আত্মদর্শন, আত্মরক্ষা, আত্মপোষণ। এই তিনটির পরস্পরের মধ্যে এমনি সম্বন্ধ যে কোন একটী ছাড়া আর দুটী আপনাকে সার্থক কর্‌তেই পারে না। যে নিজেকে বাঁচিয়ে না রেখেছে তা'র ত আত্মরক্ষারও দরকার নেই আত্মদর্শনেরও প্রয়োজন নেই। যে আত্মরক্ষা করে' না চলেছে সে আত্মপোষণও কর্‌তে পারে না, যে শরীর

মনকে অপরের শারীরিক বল মানসিক বল থেকে রক্ষা কর্‌তে না পেরেছে তা'র আত্মদর্শন অসম্ভব আর যার আত্মদর্শন না হয়েছে যার নিজের সম্বন্ধে, অপরের সম্বন্ধে, জগতের সম্বন্ধে ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম সম্বন্ধে জ্ঞান না হয়েছে সে আত্মরক্ষাতেও অসমর্থ, আত্মপোষণেও অপারগ। এই যে মানুষের তিনটী ভগবান-সিদ্ধ ইচ্ছা—এই তিনটী ইচ্ছার প্রয়োজনে মানুষের মধ্যে গড়ে' উঠেছে তিনটী ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্য, ক্ষাত্র ও বৈশ্য। মানুষের বেঁচে থাকার জন্যে এই তিনটী ধর্ম্মেরই দরকার। সুতরাং তা'র যে সমষ্টিগত অবস্থা অর্থাৎ সমাজ, সে সমাজের বেঁচে থাকার জন্যেও চাই ঐ তিন শ্রেণীর বা তিন বর্ণের লোক যারা সমাজের প্রয়োজনানুসারে সরবরাহ কর্‌বে তিনটী জিনিষ—জ্ঞান—শক্তি—অন্ন; মনের খাদ্য—প্রাণের খাদ্য—দেহের খাদ্য।

ভগবানের এ সৃষ্টির একটা মূল কথা হচ্ছে—বিচিত্রতা বহু। তাই মানুষের মধ্যে এমন এক প্রকার টাইপের লোক দেখা গেল যারা কখনও নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে না অর্থাৎ যাদের initiativeএর একান্ত অভাব। তাদের বুদ্ধিতে এমন কিছু উদ্ভাবনীশক্তি নেই প্রাণের মধ্যে এমন একটা ওজস্ নেই যাতে করে' তা'রা নিজের জন্যে নিজের বুদ্ধিতে একটা কিছু করে' উঠ্‌তে পারে একটা কিছু গড়ে' তুল্‌তে পারে, তাদের ভিতরটাই এমনি যে তা'রা অন্য কোন একটা লোকের adjunct হ'য়ে থাক্‌তে পেলেই সুখ পায় তা'তেই তাদের জীবাত্মার সন্তোষ। আর এই প্রকারের টাইপের লোক থেকেই গড়ে' উঠ্‌ল—শূদ্র।

আর তাদের ধর্ম্ম দাঁড়াল অপর তিন শ্রেণীর সেবা। তবে এক হিন্দুর মধ্যেই যে এই চার শ্রেণীর প্রত্যেক শ্রেণী একটা বিশিষ্ট রূপ নিয়ে গড়ে' উঠ্‌ল তা'র কারণ হচ্ছে সেকালের তাঁরা এই সত্যটাকে স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ কর্‌তে পেরেছিলেন এবং সেই অনু-সারে সমাজটাকে বেঁধে তোল্‌বার চেষ্টা করেছিলেন।

এখন সমাজ যে ব্রাহ্মণকে সবার চাইতে উঁচুতে আসন দেয় —তারপর দেয় ক্ষত্রিয়কে—তারপর বৈশ্য—তারপর শূদ্রকে—এটা কি একটা খামখেয়ালী ? না, এটা খামখেয়ালী নয়—এটা সজ্ঞানকৃত। এদের প্রত্যেকের আসনের মূল্য সমাজদেহের সঙ্গে এদের যে সম্বন্ধ তা'র গুরুত্বের ওপরে। জীব জগতের প্রধান ও প্রথম instinct হচ্ছে আত্মরক্ষা। ব্রাহ্মণ সবার চাইতে উঁচুতে কারণ সমাজরক্ষার জন্য সবার চাইতে দরকার ব্রাহ্মণের —ক্ষত্রিয়ের বাহুবল যদি ব্রাহ্মণের জ্ঞান বলের সাহায্য না পায়, ব্রাহ্মণের জ্ঞানবল দিয়ে যদি ক্ষত্রিয়ের বাহুবল পরিচালিত না হয়, তবে সে ক্ষাত্রশক্তি সমাজকে রক্ষা কর্‌তে পারে না কিছুতেই। বর্ত্তমানে এই যে ইয়োরোপে মহাসংগ্রাম চল্‌ছে প্রকৃতপক্ষে এ সংগ্রাম ক্ষত্রিয়ে ক্ষত্রিয়ে ততটা নয় যতটা ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে। প্রকৃতির জ্ঞান আহরণ করে' এই যে ম্যাক্সিম গান, এরোপ্লেন, সবমেরিণ, টর্পেডো, জ্যেপ্‌লিন, ট্যাঙ্ক ইত্যাদি তৈরী করা হয়েছে, এ করেছে কারা? ব্রাহ্মণ অর্থাৎ Scientist. জার্ম্মাণীর কোন বৈজ্ঞানিক বিষাক্ত গ্যাস বের করে' তা দিয়ে বিপক্ষের ক্ষাত্রশক্তিকে বিধ্বস্ত কর্‌তে চাইলে—অমনি প্যারিসে হুলস্থুল—কত শত বৈজ্ঞানিক

সেখানে মাথা একত্র করে’ লেগে গেল—ট্রেঞ্চে ক্ষাত্রশক্তি যে যায় —কর্ কর্ বের্ কর্ এমন একটা কিছু যাতে করে’ ঐ বিষাক্ত গ্যাস আর কিছুই কর্তে পার্বে না—অবশেষে এমন একটা কিছু করা গেল যাতে করে’ বিষাক্ত গ্যাস বিষহীন হ’য়ে পড়্‌ল—প্যারিসের বিজ্ঞানগারে Scientistএর জ্ঞান ট্রেঞ্চের ক্ষত্রিয়কে বাঁচিয়ে দিলে। এই Scientistরাই হচ্ছে এঁদের ব্রাহ্মণ। প্রকৃত পক্ষে যে দু’দল লড়্‌ছে এদের যদি কোন দলের ব্রাহ্মণ অপর পক্ষের ব্রাহ্মণদের চাইতে বেশী জ্ঞানবান হ’ত তবে এতদিন সেই দলই অপর দলকে পরাজিত কর্‌ত আর যুদ্ধেরও এতদিন একটা কিছু হেস্তনেস্ত হ’য়ে যেত।

বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের সর্ব্বোচ্চ স্থান, কারণ সমাজের মঙ্গল অমঙ্গল কর্‌বার ক্ষমতা ব্রাহ্মণের যত আর কারও তত নয়। কেননা ব্রাহ্মণের কারবার চিন্তাজগৎ নিয়ে, এই ব্রাহ্মণকে আমরা আধুনিক ভাষায় বলি Thinker. এতবড় একটা জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য যে একটা বিরাট ক্ষাত্রজাতিতে পরিণত হ’ল তা’র কারণ তাদের Thinkersদের চিন্তাশক্তি—নীট্‌শ, ট্রেইট্রস্‌কুক, বেরন্‌হারডি, এঁরাই হলেন জার্ম্মাণীর এ যজ্ঞের ব্রাহ্মণ। এতবড় একটা ফরাসী-বিপ্লব হ’ল, তা’র মূলে ছিল তাদের Thinkersদের চিন্তাশক্তি—রুসো, ভল্‌টেয়ার এঁরাই হলেন তা’র ব্রাহ্মণ। কর্ম্মজগৎ যে চিন্তা-জগতের অধীন এ কথাটা ত আজকাল স্কুলের ছেলেটাও জানে। আর এই চিন্তাজগৎ নিয়ে কারবার প্রধানতঃ ব্রাহ্মণের। এই ব্রাহ্মণের স্থান সবার উপরে। ব্রাহ্মণের পরেই স্থান ক্ষত্রিয়ের।

কারণ জ্ঞানবলের পরই আত্মরক্ষার জন্যে দরকার বাহুবলের, আর সেজন্যে চাই ক্ষাত্রতেজ ও সাহস। ক্ষাত্রতেজ ও সাহস না থাক্‌লে ক্ষত্রিয়ের বাহুবল না থাক্‌লে ব্রাহ্মণের জ্ঞানবল পুঁথিতেই থেকে যেতে বাধ্য, আর কালক্রমে সে পুঁথি পুরাতন হ'য়ে সনাতন শাস্ত্র বলে' পরিচিত হওয়ার একটা নিয়ম এ জগতে দেখা যায়। তার-পর আসে বৈশ্য, যার কাজ হচ্ছে সমাজের অন্ন যোগান। আর তা'র জন্যে দরকার কৃষি শিল্প বাণিজ্য। কিন্তু এ সব নির্ব্বিঘ্নে চল্‌তে পারে না যদি না দেশ ভিতরে বাহিরে শান্তিপূর্ণ থাকে। আর তা'র ভার ক্ষত্রিয়ের। সুতরাং বৈশ্যের যে কর্ম্মপ্রচেষ্টা তা নির্ভর করে ক্ষত্রিয়ের ওপরে। সর্ব্বশেষে শূদ্র, অর্থাৎ যারা ভৃত্য। অন্যের বুদ্ধিতে যারা চলে, যারা আত্মবশ নয়, অন্যের আদেশে যাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত ও চালিত হয়।

এই শূদ্র সবার চাইতে নিম্ন শ্রেণীর বর্ণ হ'লেও শূদ্রত্বটাই হচ্ছে সেই সত্য যার ওপরে ভিত্তি করে' দাঁড়িয়ে আছে সমস্ত চতুর্ব্বর্ণের অস্তিত্বটা। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এরা সবাই শূদ্র কারণ এদের কর্ত্তব্য হচ্ছে সমাজের সেবা, সমষ্টির সেবা। এদের যে সম্মান যশ প্রশংসা—এমন কি সমাজে এদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নির্ভর করে এর ওপরে যে কে কতখানি সমাজের মঙ্গলের কারণ হয়েছেন, কে কতখানি সমাজকে ঐ তিন বস্তুর, জ্ঞান শক্তি অন্নের সরবরাহ করেছেন আর এই তিন শ্রেণীর সমাজে যে ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি তা'ও নির্ভর করে তাদের ঐ সেবার ওপরে, তাদের শূদ্রত্বের ওপরে।

এই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের যে-কেউ যখন সমষ্টির সেবা ছেড়ে সে সমষ্টির ওপরে আধিপত্য কর্‌তে চায় তখন যে ভিত্তির ওপরে সে দাঁড়িয়ে আছে সেটাও টলটলায়মান হয়। যখন এদের কেউ সেবকের স্থান একেবারে ছেড়ে দিয়ে dicatatorএর পদে আপনাকে বসিয়ে দেয়, তখন তা'র পতন অবশ্যম্ভাবী। Dicatator হ'য়ে কিছুকাল থাক্‌লেও থাক্‌তে পারে যদি সে এই dicatorshipএর ভিতর দিয়ে এমন কতকগুলো মঙ্গল সমাজের সম্পত্তি করে' তোলে যে অন্য উপায়ে তা হবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু সেই dictator যদি সমাজের মঙ্গল না দেখে আপনার বা আপনার শ্রেণীর লাভই বিশেষ করে' উপার্জ্জন কর্‌বার চেষ্টায় থাকেন তবে সমাজের বুকে যে আসন পেতে তাঁরা বসে আছেন সে আসন থেকে যে তাঁরা চ্যুত হবেন সেটা অনিবার্য্য। ফ্রান্সে যে রিপাব্‌লিক স্থাপিত হ'ল তা'র কারণ এই যে সেখানকার ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় —অর্থাৎ পুরোহিতসম্প্রদায় ও আভিজাতবর্গ সমাজের সেবকের পদ থেকে আপনাদের প্রভুর পদে বরণ করেছিল। এবং সমস্ত সমাজটা যে তাদেরই সুখ সুবিধা, সম্পদ গৌরব, ভোগ ঐশ্বর্য্যের জন্যে এই কথা মনে কর্‌তে আরম্ভ করেছিল। প্রবল পরাক্রান্ত সমস্ত রুষিয়ার সম্রাটকে সমাজ-প্রকৃতির এই অমোঘ নিয়মে সিংহাসন থেকে নেমে পড়্‌তে হ'ল। আজ যে পাশ্চাত্যে Capital ও Labourএর মারামারি আরম্ভ হয়েছে তা'রও কারণ ঐ। সেখানকার Capitalistsরা অর্থাৎ বৈশ্য সম্প্রদায় সমাজের সেবকের পরিবর্ত্তে হ'য়ে দাঁড়িয়েছে দেশের প্রভু—যেন সমস্ত সমাজটা

তাদের সুখের জন্যেই গড়ে' উঠেছে। এই সমস্তের পিছনে সেই একই নিয়ম—কোথায় কোন শ্রেণী শূদ্রত্ব থেকে স্খলিত হয়েছে—তা'রই হিসেব নিকেশ।

কর্ম্মের ভিতর দিয়ে সমাজের মঙ্গল আসে। যে-সমাজের নরনারী কর্ম্মহীন বা কর্ম্মবিমুখ এ জগতে তাদের মঙ্গলের স্থান নেই। কারণ মানুষের যা প্রয়োজন—সুস্থ সবল দেহে, সন্তোষ মনে, সন্তুষ্টচিত্তে বেঁচে থাকার জন্যে তা'র যা দরকার তা আহরণ করতে হলে সমাজকে কর্ম্ম করতে হবে। কিন্তু আগেই বলেছি কর্ম্মজগত চিন্তাজগতের অধীন। আর এই চিন্তাজগৎ নিয়ে কারবার ব্রাহ্মণের। সুতরাং যদি কোন সমাজের অমঙ্গল হয় তবে তা'র জন্যে দায়ী প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ। কারণ ব্রাহ্মণ সমাজকে এমন শিক্ষা দিতে পারেন নি—এমন চিন্তায় নর-নারীকে পূর্ণ করে' তুলতে পারেন নি যাতে করে' তা'রা প্রয়োজনীয় কর্ম্ম করে' সমাজের মঙ্গল করতে পারে। ব্রাহ্মণ সমাজকে এমন মন্ত্র দান করতে পারেন নি, এমন পথ নির্দ্দেশ করে' দিতে পারেন নি যাতে করে' সমাজ এই চির-পরিবর্ত্তনশীল জগতে সমাজে সমাজে দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে বিরতিহীন সংঘর্ষের মিলনের লেনাদেনা দেনাপাওনার মধ্যে সেই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে সেই পথ ধরে' সমাজের মঙ্গলকে স্থায়ী করে' রাখতে পারে। সুতরাং যখনই একটা সমাজের বা একটা দেশের অধঃপতন দেখবে তখনই বুঝতে হবে যে সে-সমাজের বা সে-দেশের ব্রাহ্মণের অধঃপতন হয়েছিল।

আমরা যে আজ আমাদের ব্রাহ্মণদের মান্‌ছি না তা'র কারণ এই হচ্ছে, জ্ঞান দিয়ে যে-সমাজের সেবা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য—সেই জ্ঞান দিয়ে সমাজের মঙ্গল কর্‌বার ক্ষমতাই তাঁদের নেই। আমাদের যে ব্রাহ্মণরা, তাঁদের খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর হিন্দু-সমাজের কোন মঙ্গল কর্‌বার ক্ষমতা থাক্‌লেও থাক্‌তে পারে—কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীর হিন্দুসমাজের কোন রকম মঙ্গল সাধন করা তাঁদের বিদ্যের নেই এ কথা বেশ জোর করে' বলা যেতে পারে। কারণ এদের যে জ্ঞানের রাস্তাটা সেটা 'স্মৃতি' পর্য্যন্ত এসে থেমে গিয়েছে। এই 'স্মৃতি'র পরে এঁদের পঞ্জিকার সনও নেই তারিখও নেই। এই 'স্মৃতি' পর্য্যন্ত এসে এরা পিছনের দিক তাকিয়ে তাঁদের স্মৃতির পটে তন্দ্রাবশে এম্‌নি এম্‌নি স্বপ্ন দেখ্‌ছেন যেটা আমাদের বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের পক্ষে নিতান্তই মায়া—আর বর্ত্তমান অহিন্দুজগতের কাছে অত্যন্তই হাস্যজনক।

আমাদের ব্রাহ্মণদের মনোজগৎ যে কালের সঙ্গে সঙ্গে পা ফেলে চল্‌তে পারে নি তা'র প্রমাণ আমরা যতদূর পিছিয়ে পড়েছিলেম সেটুকু সেরে নেবার জন্যে আজ আমরা পাশ্চাত্যের জ্ঞানের মন্দিরের দ্বারস্থ। যে-জাতি সভ্যতার প্রথম ধ্বজা উড়িয়ে অন্ধকারের কোণ থেকে প্রথমে আলোকে বেরিয়ে এসে পৃথিবীর বুকে সগর্ব্বে চল্‌তে লেগেছিল—তা'রাই আজ পিছনে পড়ে' গেল। তা'র কারণ সে-জাতির ব্রাহ্মণ নতুনকে বরণ করে' নিতে পারে নি—নতুনের সঙ্গে সঙ্গে আপনার সমাজের গতি নির্দ্দেশ করে' দিতে পারে নি—নতুনকে বরণ করে' আপনার জ্ঞানে তা'কে

গৌরবমণ্ডিত করে' তুল্‌তে পারে নি। আজকাল ব্রাহ্মণ যে সমাজের মুক্তির পথ মঙ্গলের পথ সত্যের পথ সুন্দরের পথ সমাজের নরনারীকে দেখিয়ে দিতে পারেন নি তা'র প্রমাণ আজ ব্রাহ্মণের প্রতি সমাজের অনাদর ও ভক্তিহীনতা। যেটুকু ভক্তি আছে সেটুকু অতীতের স্মৃতির কৃতজ্ঞতাসূচক—আর কিছুই নয়। কারণ ব্রাহ্মণ বর্ত্তমানে আপনার দায়িত্বকে অবহেলা করেছেন—অবশ্য আমাদের মনে হয় স্বেচ্ছায় ততটা নয় যতটা অজ্ঞতায় ও অক্ষমতায়।

সুতরাং ব্রাহ্মণের আর শুধু পৈতে দেখিয়ে সমাজের কাছ থেকে সম্মান আদায়ের চেষ্টা সফল হবে না—বৈদিক মন্ত্র আওড়িয়ে রজতখণ্ড অর্জ্জনের ব্যবস্থাও ধীরে ধীরে লোপ পাবে। কারণ সমাজের অকেজো যা—যার দ্বারা সমাজের উপকার সাধন হচ্ছে না—তা সমাজ কখন মাথায় করে' রাখ্‌বে না—আর কেবল বৈদিক মন্ত্র পাঠেই যে সমাজের অবস্থা ফিরে যাবার কোন সম্ভাবনা আছে তা'র কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সুতরাং দিনে দিনে এই ব্রাহ্মণের যে সমাজে অনাদর বেড়ে যেতেই থাক্‌বে সেটা অনিবার্য্য—সমাজ-প্রকৃতির সেটা অমোঘ নিয়ম—যার ব্যতিক্রম কোন দিন হয় না।

কিন্তু হাজার অনধিকারী হোক্ যিনি যেটা অনেক দিন উপভোগ করে' এসেছেন তিনি সেটাকে সহসা ছেড়ে দিতে রাজি হন না। তাই আজ বাংলাদেশে ব্রাহ্মণসভা—তাঁদের সমিতি, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির কথা শোনা যাচ্ছে—কারণ ব্রাহ্মণের আসন যে যায় যায় তা তাঁদের বুঝ্‌তে বাকি নেই—এবং

সেই আসনকে বজায় রাখ্‌বার জন্যেই ব্রাহ্মণের এই একটু কর্ম্মশীলতার আভাস দেখা যাচ্ছে—অবশ্য এতে আমাদের ভয় পাবার কিছু নেই—কেননা এই যে ব্রাহ্মণদের কর্ম্মশীলতার আভাস সেটা তাঁদের জীবন-ঊষার নব কর্ম্মের উৎসাহচ্ছটা নয়—সেটা হচ্ছে তাঁদের নির্ব্বাণোন্মুখ জীবন-দীপের শেষ দীপ্তি। কারণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম সত্য কিন্তু বর্ত্তমানের ব্রাহ্মণ সত্য নন্।

এখন সমাজকে জাতিকে দেশকে উঠ্‌তে হ'লে চাই সর্ব্বপ্রথমে এক নবীন ব্রাহ্মণের অভ্যুত্থান—যে-ব্রাহ্মণের মন সকল প্রকার বন্ধনমুক্ত, সংস্কারমুক্ত—সজীব, স্বাধীন, অন্তরের জ্ঞানে জ্ঞানবান। যাঁর ভাঙ্‌বার সাহস আছে—গড়্‌বার শক্তি আছে। কারণ সমাজ একটা গতিশীল এবং প্রাণবান্ সমষ্টি। তা'কে কখনও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সংগ্রাম কর্‌তে হয় কখনও বা পারিপার্শ্বিকের অবস্থানুযায়ী আপনাকেই গড়ে' নিতে হয়—কখনও বা সে পারিপার্শ্বিককে আপনারই করে' নিতে হয়। সেজন্য সমাজদেহে পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য। সুতরাং ব্রাহ্মণের মন চাই মুক্ত—মুক্ত মন না হ'লে জ্ঞানলাভ সত্যলাভ কিছুতেই হ'তে পারে না—আর জ্ঞানলাভ সত্যলাভ না হ'লে ব্রাহ্মণ কখন সমাজকে মঙ্গলের পথ সুন্দরের পথ নির্দ্দেশ করে' দিতে পারেন না। আজ আমরা এই নবীন ব্রাহ্মণদলের জন্যে অপেক্ষা করে' বসে' আছি—যতদিন নবীন ব্রাহ্মণের অভ্যুত্থান না হবে ততদিন নবযুগ কখনই আপনাকে সার্থক করে' তুল্‌তে পার্‌বে না।

দরকার

দরকার জিনিষটা—necessity জিনিষটা—ইয়োরোপীয় সভ্যতার কথা—সৃষ্টির মূলে কিন্তু এর কোন অস্তিত্ব নেই। বল্‌ছি না যে দরকারের ওপরে ইয়োরোপীয় সভ্যতা গড়ে' উঠেছে—বল্‌ছি এই যে ইয়োরোপীয় সভ্যতার ভিতরেই দরকার জিনিষটা গজিয়ে উঠেছে। তাই আমরা শুন্‌তে পাই Necessity is the mother of invention—একটা প্রকাণ্ড মিথ্যে কথা—necessity, inventionএর mother ত নয়ই, মাসী পিসীরও কেউ নয়—চোদ্দ পুরুষের কেউ নয়। ওটা একটা নিতান্ত প্রাকৃতজনের কথা 'ধর্‌তাই বুলির'ই একটা বুলি। Inventionই বল discoveryই বল আর যাই বল এর মূলে রয়েছে মানুষের আনন্দ—প্রকাশ কর্‌বার আনন্দ—সৃষ্টি কর্‌বার আনন্দ।

এই দরকার জিনিষটার পাল্লায় পড়ে' কিন্তু আমরা জগতের কারবারে বেজায় ঠকে গেছি। তবে আমরা এই দরকারের পাল্লায় প'ড়েছি ভিন্ন রকমে। ইয়োরোপ বল্‌ছে—আমার এটা দরকার, ওটা দরকার, সেটা দরকার। তাই তা'র চারপাশে রাশিকৃত বস্তু আর বিষয় জমা হ'য়ে উঠেছে—জলে স্থলে আকাশে

তা'র আর সাজ সরঞ্জামের ইয়ত্তা নেই। তা'র দেহে মনে প্রাণে এমন একটু ফাঁক নেই যেখানে অবসর নামক জীবটী এসে ছ'দণ্ড বস্‌তে পারে। তা'র সব দরকার। এ জগতে যা কিছু দেখ্‌ছি শুন্‌ছি কর্‌ছি সবই তা'র 'দরকার'—তা'র Comfortএর জন্যে। আমরা কিন্তু এই দরকারকে দেখ্‌ছি নিছক 'দরকার' করে'। আমরা বল্‌ছি—এ জগতের কাছ থেকে নেব সেটুকু ঠিক যেটুকু আমার 'দরকার'। ইয়োরোপের দরকারটা হচ্ছে বড়মানুষী দরকার আর আমাদের দরকারটা হচ্ছে কৃপণতার দরকার। আমরা বল্‌ছি—কাপড়টা ত লজ্জা নিবারণের জন্যে? বেশ একটুকু কৌপীনই যথেষ্ট। ভাল পোষাকের দরকারটা কি? শুধু কত-গুলো টাকা খরচ বইত নয়। বাজে খরচ—যার কোন দরকার নেই। খাওয়াটা ত বেঁচে থাকার জন্যে? ছুটো চাল আর কাঁচকলা—ব্যস্‌। চব্য চোষ্য লেহ্য পেয়ের দরকারটা কি বাপু? এই যুক্তি তর্কই বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে অগ্রসর হ'য়ে হ'য়ে আমরা এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌছালেম যেখান থেকে আমাদের দিব্যি মালুম হ'য়ে গেল যে—আমাদের বেঁচে থাকাটারই কোন দরকার নেই। সেদিন থেকে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের পাতায় পাতায় নির্ব্বাণ মুক্তির তত্ত্বটা খুব জোর ফুটে' উঠ্‌ল।

এই যে ইয়োরোপের দরকারের ব্যাখ্যা আর আমাদের দরকার তত্ত্ব এ ছুটোর মধ্যে কিন্তু আমাদের দরকারতত্ত্বের মধ্যেই মানুষের সম্বন্ধে একটা গভীরতর দার্শনিক সত্য নিহিত রয়েছে। বাস্তবিক মানুষের কিছুরই দরকার নেই। এমন কিছু নেই যা না হ'লে

মানুষের একেবারেই চলে না। এই যে জামাটা পর্‌ছি, জুতোটা পায়ে দিচ্ছি—এই যে এটা ওটা সেটা—এসব না হ'লে কি মানুষের দিন কাট্‌বে না? খুব কাট্‌বে। ঐ যে মানুষ গাড়ীর আগে ঘোড়া লাগিয়ে ছুট্‌ছে—লোহার রেল পেতে তা'র ওপর দিয়ে এঞ্জিন চালিয়ে দেশ বিদেশে যাচ্ছে—আবার এরোপ্লেনে আকাশে উড়্‌ছে—এ সব না হ'লেও যে মানুষের খুব চলে তা'র প্রমাণ যে এ সব যথন ছিল না তথনও মানুষ ছিল—আর এ সব ছিল না বলে' যে তা'রা কেঁদে কেঁদে দিন কাটাত তা'রও কোন প্রমাণ নেই। এটা খুব সত্যি কথা যে মানুষের কিছুরই দরকার নেই। এ সম্বন্ধে আমাদের কোন ভুল হয়নি। কিন্তু আমরা ভুল কর্‌লেম তথন, যথন সিদ্ধান্ত কর্‌লেম যে মানুষের যে এই কিছুরই দরকার নেই সেটাই হচ্ছে মানুষের সম্বন্ধে চরম জ্ঞান—আর নির্ব্বাণ মুক্তিটা—পরব্রহ্মে লীন হ'য়ে যাওয়া থিওরিটা এই চরম জ্ঞানেরই স্বাভাবিক পরিণতি অর্থাৎ logical conclusion.

কিন্তু এই যে "মানুষের কিছুরই দরকার নেই" এত বড় একটা সত্য রয়েছে—এ সত্বেও কেন আজকার মানুষ এমন? তা'র চার পাশে অদরকারী হাজার জিনিষের স্তূপ—হাজার হাজার বস্তু দিয়ে বিষয় দিয়ে সে আপনাকে এমনি করে' ফুলিয়ে তুলেছে যে তা'র আর আসল স্বরূপ দেখ্‌বার জো নেই—তা'র চামড়াও দেখা যায় না, গায়ের রংও দেখা যায় না। কেন এমন? তা'র কারণ হচ্ছে যে "মানুষের কিছুরই দরকার নেই" এ সত্যের চাইতেও একটা বড় সত্য মানুষের সম্বন্ধে আছে সেটা হচ্ছে এই যে মানুষের সত্তাটা আনন্দ-

ময় আর তাঁর প্রকৃতি চিন্ময়ী। আর সেই জন্যেই মানুষ এ জগতে negative হ'য়ে থাক্‌তে পারে না কিছুতেই।

শিশু যে কাদা দিয়ে পুতুল গড়ে, আর বৈজ্ঞানিক যে লোহা দিয়ে এরোপ্লেন তোয়ের করে—এর একটা যেমন অকেজো আর একটাও তেমনি অদরকারী। তবুও শিশুই বা পুতুল গড়ে কেন আর বৈজ্ঞানিকই বা এরোপ্লেনে ওড়ে কেন? এ দুটোর পিছনে একই সত্য কাজ কর্‌ছে—সেটা হচ্ছে শিশুর ও বৈজ্ঞানিকের প্রাণের আনন্দ—তাদের সৃষ্টি কর্‌বার আনন্দ। ঐ পুতুল আর এরোপ্লেন যতই মিথ্যা হোক্ যতই অদরকারী হোক্—কিন্তু শিশু আর বৈজ্ঞানিকের অন্তরের আনন্দের একটা মূল্য আছে সেটা অতি সত্য—আর ঐ পুতুল আর এরোপ্লেন মানুষের ঐ আনন্দ সত্যেরই দুটো সাকার মূর্ত্তি। এই হিসেবে ওদের মূল্যের অন্ত নেই।

বালকের অর্থহীন গোলমালই বল আর কবির ছন্দোবন্দ গানই বল এ দুয়ের পিছনেই রয়েছে তাদের সত্তার—তাদের existenceএর আনন্দ। আর এই যে আনন্দ-সত্য তা আমাদের ঐ দরকার-তত্ত্বের চাইতে বড়। কারণ আমাদের দরকার তত্ত্ব হচ্ছে a philosphy of negation—আর এই আনন্দ-সত্য হচ্ছে positive কিছু। আর সবার চাইতে মজার কথা হচ্ছে এই যে, এই আনন্দ-সত্য আজ আমরা সজ্ঞানে অবহেলা কর্‌ছি আর ইয়োরোপ আজ তা অজ্ঞানে পালন কর্‌ছে।

তাই আমরা আজ যা কিছু কর্‌ছি সব আমাদের কাছে মিথ্যা

হ'য়ে উঠ্‌ছে—নিরর্থক হ'য়ে উঠ্‌ছে। কারণ বস্তুর সার্থকতা ত বস্তুর মধ্যে নেই—বস্তু ত জড়। তা'র সার্থকতা আমার মনের মধ্যে আছে—আমার প্রাণের আনন্দ-ভাবের মধ্যে আছে। এই আনন্দই শুধু আমাকে সার্থকতা মিলিয়ে দিতে পারে। তাই ইয়োরোপ যা কিছু করে তা'র মধ্যে সে আপনার একটা সার্থকতা খুঁজে পায়। কারণ তা'র প্রাণের আনন্দ তা'র কাছে সত্য। তা'র প্রাণের আনন্দের সংস্পর্শে যা কিছু আসে তা'ই প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। অথচ আমাদের বলার কামাই নেই যে ইয়োরোপ জড়ের সেবক। আসল কথা হচ্ছে যে ইয়োরোপ যদি জড়ের সেবক হ'ত তবে সে জড়কে এমন আপনার করে' নিতে পার্‌ত না—এমন করে' সে জড়ের ওপরে আপনার আধিপত্য বিস্তার কর্‌তে পার্‌ত না। ইয়োরোপ বিশিষ্টার্থে আধ্যাত্মিক নয় নিশ্চয়—কিন্তু জড় ইয়োরোপকে বাঁধে নি—তা'র দেহকেও না—তা'র মনকেও না। ইয়োরোপ দেহ সর্ব্বস্ব নয় তা'র প্রমাণ—বর্ত্তমান যুদ্ধ। আর তা'র মনটা যে বদ্ধও নয়, অন্ধও নয় তা'র প্রমাণ—তা'র সচলতা।

জড়, জড় তখন যখন মানুষের মন হ'য়ে ওঠে অচল। অচল মনের ওপরে যা কিছু পড়ে তা'র বোঝা হ'য়ে উঠে। পাষাণ-প্রতিমা পাথরের টুকরো হ'য়ে ওঠে তখন যখন পূজকের মনে আর পূজার আনন্দ নেই—আছে শুধু পুণ্যলাভের কল্পনা—স্বর্গলাভের কামনা। তাই আজ আমরা যা কিছু কর্‌ছি তা আর আমাদেকে অমৃত মিলিয়ে দিতে পার্‌ছে না—দিচ্ছে আমাদেকে বন্ধন পরিয়ে।

এটা খুব সত্যি কথা যে মানুষের কিছুরই দরকার নেই। তা'র

শুধু একখানি কৌপীন আর দুটী চাল হলেই চলে’ যায়। কিম্বা কৌপীনটাকেও বাদ দেওয়া যেতে পারে—উলঙ্গতেই বেশ চলে’ যায়—শুধু দুটী চাল হলেই হ’ল। কিম্বা চালেরও দরকার নেই—কারণ তা’র বাঁচারই বা দরকার কি? কিছুই না। মানুষের দিক থেকে ত কোনই দরকার নেই—ভগবানের দিক থেকে কোন দরকার আছে কি না তা ত আমরা জানিই না—আর যদি বা থাকে সেটা ত আমরা মানিই না। কিন্তু তবুও যে মানুষ বেঁচে আছে—তা’র অন্তরে বাহিরে হাজার বিষয়ের হাজার স্তূপ সাজিয়ে—কেন? কারণ মানুষ একটা negative formula নয়—মানুষ হচ্ছে একটা positive জীব। এই জীবকে বাঁচিয়ে রেখেছে আনন্দ, আর মানুষের সম্বন্ধে যা কিছু তা এই আনন্দেরই অভিব্যক্তি।

এই যে মানুষের অসংখ্য বস্তু বা বিষয় আহরণের ক্ষমতা, ভোগের ক্ষমতা—এটা তা’র আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপন্থী নয়—এটা তা’র প্রাণের আনন্দ-প্রাচুর্য্যেরই চিহ্ন। রোগীর আহারে অরুচি যেমন তা’র ত্যাগের ফল নয়—সেটা তা’র রোগেরই একটা চিহ্ন—তেমনি যে-জাতির জগতের প্রতি অরুচি দেখা দিয়েছে সেটা সে-জাতির আধ্যাত্মিকতার চিহ্ন মোটেই নয়—সেটা তা’র অসুস্থতারই চিহ্ন—আনন্দহীনতার লক্ষণ—সেটা হচ্ছে তা’র মৃতোন্মুখ প্রাণের মৃদুস্পন্দন জ্ঞাপক। কারণ আনন্দের ধর্ম্মই হচ্ছে মিলন—অন্তরের সহিত বাহিরের। মানুষের যে প্রাণের আনন্দ সে আনন্দের রতিই হচ্ছে গতিতে—বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে—রূপ থেকে রূপান্তরে—

রস থেকে রসান্তরে। কারণ আনন্দের ধর্ম্ম subtraction নয় আনন্দের ধর্ম্ম হচ্ছে multiplication. আর তাই অদরকারী হ'লেও হাজার হাজার বস্তু ও বিষয় দিয়ে মানুষ আপনাকে ফুলিয়ে তুলেছে।

সুতরাং আজকাল যে আমরা আমাদের চরম simplicity নিয়ে যখন তখন বড়াই করি সেটা হচ্ছে আমাদের প্রাণের আনন্দ-হীনতার লক্ষণ—মানুষের বেঁচে থাকার যে একটা স্বাভাবিক আনন্দ আছে আমরা সেটার অনুভব হারিয়েছি। ভগবানের নিয়মানুসারে—সৃষ্টির ধর্ম্ম অনুসারে এই আনন্দ মানুষের অত্যন্ত সহজলভ্য—তেম্‌নি সহজলভ্য যেমন সহজলভ্য তা'র নিশ্বাস নেবার বাতাস। যার জীবনের এই আনন্দ ধর্‌বার জন্যে দিনে দশবার করে' কুম্ভক কর্‌তে হয়—পঞ্চাশ বছর ধরে' এক প্রাণায়াম করেই কাটিয়ে দিতে হয়—তথনই বুঝ্‌তে হবে যে তা'র নির্ব্বাণের দিন ঘনিয়ে এসেছে। কারণ আনন্দই সৃষ্টির সত্য—নিরানন্দ মিথ্যা। সত্যের চাইতে মিথ্যাটা সত্য হ'য়ে ওঠে সৃষ্টির ধ্বংসেরই জন্যে। যেমন মানুষের স্বাস্থ্যই সত্য। যার স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে ডোজে ডোজে অশ্বগন্ধা ওয়াইন খেতে হয়, হাজার হাজার পঞ্চতিক্ত বটিকা গিল্‌তে হয়—তা'র দেহটা পচ্‌বার বড় বেশী বিলম্ব থাকে না। ইয়োরোপ কুম্ভকও করে না প্রাণায়ামেরও ধার ধারে না কিন্তু তা'র জীবনে যে আনন্দ আছে তা আমাদের নেই। আর সেইজন্যে ইয়োরোপের লোক আপনার জীবনটাকে যতখানি সত্য করে' পায় সার্থক করে' পায় আমরা তা পাইনে। এর উত্তরে

অবশ্য একটা সনাতন জবাব আছে যে ইয়োরোপ জীবনটাতে মজে' আছে বলে' সে মরণটাকে ভয় করে। ইয়োরোপের লোক মর্‌তে ভয় পায়—এটা একটা ঘোর মিথ্যা কথা—তা'র চাইতে ঢের বেশী ভয় পাই আমরা, যদিও আমরা জগৎটাকে মায়া বলে' নিতান্তপক্ষে নশ্বর বলে' উড়িয়ে দি। এর উত্তরে কেউ হয়ত বল্‌বে—জীবন মরণের কথা ছাড়। ইয়োরোপ ভগবানকে পায় নি। আমরাই যে ভগবানকে পেয়েছি—আমাদের মুখ চোখ দেখ্‌লে—আমাদের অন্তরের স্পন্দন শুন্‌লে কোন বুদ্ধিমানেরই তা মালুম হবে না। আসল কথা ইয়োরোপ ভগবানকে পায় নি—আমরাও ভগবানকে হারিয়ে বসে' আছি। কিন্তু ইয়োরোপ বেঁচে থাকার যে সহজ লভ্য আনন্দ তা থেকে আজও বঞ্চিত হয় নি। আর আমাদের মধ্যে যারা একটু adventurous ধরণের লোক তা'রা এই আনন্দকে ধর্‌বার জন্যে তু'বেলা বেলের পাত চিবিয়ে—চার ঘণ্টা আসন করে' কাটিয়ে—ছ'ঘণ্টা অনুষ্টুপ ছন্দের মন্ত্র আওড়িয়ে—জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত কাটিয়ে দিচ্ছে। আর তা'তে দশজনের বাহবাও লাভ কর্‌ছে।

জীবনের এই যে স্বাভাবিক সহজলভ্য আনন্দ তা আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠা করা ত দূরের কথা—সে-আনন্দ আমাদের জীবনে ফিরিয়ে আন্‌বার পথে যত বাধা বিঘ্ন সম্ভব তা আমাদের ধর্ম্ম-ব্যাখ্যাতারা জড় করে' সাজিয়ে রেখেছেন। প্রথমতঃ—সৃষ্টিতত্ত্বের যে আনন্দ দিয়ে অন্তরপূর্ণ কর্‌তে চাচ্ছি—ধর্ম্মব্যাখ্যাতা বল্‌ছেন যে সেই সৃষ্টিটাই মিথ্যা—মায়া ফাঁকি ভগবানের দাগাবাজি—এখানে

সৃষ্টিও নেই আনন্দও নেই। বোসো পদ্মাসন হ'য়ে—নিশ্বাস টেনে —চোখ উল্টিয়ে যদি আনন্দ চাও। আবার যারা ভগবানকে নেহাৎ তেমন জুয়াচোর বল্‌তে নারাজ তা'রা বল্‌ছে—হাঁ—সৃষ্টিটা একরকম আছে বটে তবে ওটা নশ্বর। এই সব কথা শুন্‌তে শুন্‌তে এমনি অবস্থায় আমরা এসে পড়্‌লেম যে আমরা মনে মনে বল্‌তে লাগ্‌লেম যে এই সৃষ্টি যদি মিথ্যাই হয় তবে এই সৃষ্টির সঙ্গে কারবারটা উঠিয়ে দেওয়াই ভাল। সেদিন থেকে আমাদের জাতিটার মধ্যে এমন একটা Unconscious Willএর সৃষ্টি হ'ল যে-Willটা আমাদের বেঁচে থাকার আনন্দের ওপরে একটা প্রকাণ্ড অচলতার ভার চাপিয়ে দিলে। ধীরে ধীরে যখন আমরা এই আনন্দকে সম্পূর্ণ করে' হারিয়ে ফেল্‌লেম তখন এই সৃষ্টিটা বাস্তবিকই আমাদের কাছে অসত্য হ'য়ে উঠ্‌ল। কারণ মানুষের যা'তে আনন্দ নেই তা'তে তা'র সত্যও নেই। কারণ আনন্দই হচ্ছে গোড়ার কথা—তারপর চিৎ—তারপর সৎ।

এখন আবার সেই সৃষ্টির সহজলভ্য আনন্দকে জীবনে ফিরিয়ে আন্‌তে হ'লে আমাদের ঠিক উল্টো দিকে দাঁড় টান্‌তে হবে। আমাদের জাতির মনে এমন একটা Conscious Willএর সৃষ্টি কর্‌তে হবে যেটা বল্‌বে যে এই জগৎ সত্য—এই জগতেই আছে অমৃত—আছে আনন্দ। এ যেন এক রকমের মন্ত্র। এই মন্ত্রের গুণে আমাদের বুকে বুকে যে স্পন্দন শতাব্দী শতাব্দী ধরে' থেমে ছিল তা ধীরে ধীরে দেখা দেবে—যে প্রাণের স্রোত নিষ্ক্রিয়তার বালিতে ভরাট হ'য়ে উঠেছিল তা আবার অজস্র বেগে

ছুট্‌বে—মনের আশা আকাঙ্খা যা সঙ্কীর্ণ হ'য়ে হ'য়ে শুধু উদরের দুটী শাক অন্নে এসে ঠেকেছিল তা আবার সারা বিশ্বকে আলিঙ্গন করতে চাইবে। এমনি করে' ধীরে ধীরে আমাদের জীবনে ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতা, অক্ষমতার বদলে বৃহতের, উদারতার, সামর্থ্যের প্রতিষ্ঠা হবে—তখন আমরা আমাদের স্বরূপকেও বুঝ্‌ব—আর ভগবানকেও চিন্‌ব তখন। কারণ নিজেকে না জান্‌লে ভগবানকে জানা যায় না—আর তা'র কারণ হচ্ছে এই যে God made man in His own image. কিন্তু এ জানার মানে নিজের কিছু বাদ দিয়ে জানা নয়—"নেতি নেতি" করে' জানা নয় —"ইতি ইতি" করে' জানা। এই রকম করে' আমরা দেখ্‌তে পাব যে আমাদের ইন্দ্রিয়খানি জ্ঞানের দ্বারই নয়, ভোগের দ্বারও বটে, ভগবানের দ্বারও বটে। মানুষ যেদিন তা'র ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়ে ভগবানকে আর ভোগকে একসঙ্গে তা'র জীবন-দেবতার কাছে পৌঁছে দিতে পারবে সেদিন মানুষ হ'য়ে উঠ্‌বে সত্যতম, দীপ্ততম, মুক্ততম। আর আমাদের অন্তরটাও সেদিন পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌বে আনন্দে—কারণ যেখানেই মানুষ সত্য সেখানেই তা'র আনন্দ।

যেদিন আমরা আনন্দে পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ব সেদিন দেখ্‌তে পাব যে এই সৃষ্টিটা অদরকারী বলেই এ পৃথিবীর হাজার বস্তু হাজার বিষয় মানুষের অপ্রয়োজনীয় বলেই তা'তে মানুষের এত আনন্দ। কারণ যেখানেই দরকার সেখানেই দাসত্ব। হাজার হাজার জিনিষ মানুষের কোন দরকার নেই বলেই তা'তে তা'র মজা। এ সৃষ্টির ভিতরের কথাটাও ঐ।

যে ভগবান-সিদ্ধ সত্যে গড়া সেই সত্যে যেদিন আমরা সত্য হ'য়ে উঠ্‌ব সেদিন আমরা ঐ কৃপণতার দরকারকে অতিক্রম করে' বড়মানুষী দরকারে গিয়ে উঠ্‌ব। কারণ আমাদের অন্তরটা তখন বড়মানুষ হ'য়ে উঠ্‌বে—মানুষের বেঁচে থাকার সহজলভ্য আনন্দের ঐশ্বর্য্যে। আর অন্তরটা যেদিন আমাদের বড়মানুষ হ'য়ে উঠ্‌বে সেদিন বাহিরেও আর কেউ আমাদেকে ছোট করে' রাখ্‌তে পারবে না। কারণ মানুষের বাহিরটা তা'র অন্তরের সত্যেরই প্রতিবিম্ব অর্থাৎ reflection.

———

ইয়োরোপের কথা

যখন শিশুটী ছিলুম তখন সবার চাইতে যে-কথাটা জানতুম না সেটা হচ্ছে এই যে—আমি শিশু। আজকের মতো কোনদিনই তখন একটুও মনে হয় নি যে—আমি মানুষ। কিন্তু তবু সেদিন জীবনে আনন্দের ব্যাঘাত হয় নি—বরং তখনই ছিল জীবনে পরি-পূর্ণ আনন্দ। কারণ জীবনের যে আনন্দ তা জীবন সম্বন্ধে যে জ্ঞান তা'র ওপরে নির্ভর করে' নেই একটুও। জীবনের যে আনন্দ তা স্বরাট—তা কারোই তোয়াক্কা রাখে না।

তাই সেই শিশুকালে জীবনে ব'য়ে গেছে আনন্দের অব্যাহত ধারা। জীবন তখন তা'র বাইরের কিছু দিয়েই আপনাকে মাপ্‌তে চায় নি—বাইরের কিছুর সঙ্গেই দর দস্তুর করে' আপনার একটা মূল্য নিরূপণ করে' বসে নি—আপনাকে কোন প্রয়োজনের দিক থেকে মোটেই দেখে নি। জীবনের এই অনাবিল আনন্দধারা নিয়ে তাই সে যা তা নিয়ে খেলেছে। একটা লাল টুক্‌টুকে খেল্‌না—একটা পুতুল—একটা মাটীর ঢিবি—সবই তা'র জীবনের আনন্দের সাহচর্য্যে আনন্দময় হ'য়ে উঠেছে—সত্য হ'য়ে উঠেছে। শিশু-জীবনে জ্ঞান ছিল না—কিন্তু ছিল এই আনন্দ। আর এই

জ্ঞান ছিল না বলে' এ কথা বলা চলে না যে শিশু ছিল জড়ের সেবক—কারণ সে খেলা করেছে কাঠের পুতুল নিয়ে—ধরিত্রীর ধূলো দিয়ে। বরং ঠিক তার উল্টো। শিশু-জীবনেই প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের—এই সৃষ্টির আসল সত্যটি—সেই সত্যটি হচ্ছে আনন্দ। শিশুর অন্তরের আনন্দ-সত্যের স্পর্শে তা'র বাইরের সবই সত্য হ'য়ে উঠেছে। আর এই হচ্ছে চূড়ান্ত আধ্যাত্মিকতা।

ঠিক তেম্‌নি—ইয়োরোপ শিশু কিনা জানি নে—কিন্তু ইয়োরোপ যে নিতান্তই জড়ের সেবক—ভীষণ materialist—এই সব কথা বলে' বলে' যে আমরা রাতদিন নাসিকা কুঞ্চিত করে' বেড়াই সেটা শুধুই এই-ই ঘোষণা করে যে আমাদের চোখ দুটো আসল দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত—তাই আমাদের অন্তরে—এতদিন ধরে' যেটা সঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌ল সেটা হচ্ছে মূঢ়ের আত্মম্ভরিতা—অলসের আত্মপ্রতারণা—অকর্ম্মণ্যের ঔদাসীন্য।

ইয়োরোপ তা'র অন্তরের, তা'র প্রাণের, তা'র জীবনের আনন্দ দিয়ে যে-সভ্যতা গড়ে' তুল্‌ল—যে-সভ্যতা সকল পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেল—যে-সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমাদের সনাতন জাতির পুরাতন দেহে নূতন প্রাণ জেগে উঠ্‌ল—সে-সভ্যতা একটা গভীর জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত হ'তে না পারে—তা'তে হাজার রকম ভুল ভ্রান্তি থাক্‌তে পারে—হয়ত তা'তে মানুষের সম্বন্ধে সকল সমস্যার সমাধান হ'য়ে ওঠে নি—কিন্তু তাই বলে' যে সে-সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে' আছে কতগুলো জড় বস্তুসমষ্টির

ওপরে এ-কথা যে বলে তা'র মতো জড়বাদী এ ভূভারতে আর দু'জন নেই। এই জড়বস্তুসমষ্টির তলায় পড়ে আমাদের মতো একটা বিরাট আধ্যাত্মিক জাতি যে একেবারে চ্যাপ্টা হ'য়ে যাবার মতো হ'ল—আবার তারি সংস্পর্শে নূতন প্রাণ লাভ করে' জেগে উঠ্ল—এটা অন্ততঃ তর্কের খাতিরেও আধ্যাত্মিক পাদ্রিদের মানা উচিত নয়। জড়বস্তুর এমন শক্তি—তা এক নাস্তিক ছাড়া আর কেউ মান্বে না।

কিন্তু এমন একদল লোক আছেন যাঁরা বলেন যে ইয়োরোপের সভ্যতা যে জড়সর্ব্বস্বতার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে তা'র প্রমাণ চোখ খুল্লেই ত ধরা পড়ে—নইলে কি আর তা'রা এত ভোগ-বিলাসী হয়—নইলে কি আর তা'রা এত মারামারি করে খুনোখুনি করে। কিন্তু মানুষ কোন্ কালে যে ভোগী ছিল না, কোন্ যুগে যে কোন্ দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ হয় নি তা ত ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে খুঁজে পাওয়া যায় না। যে-যুগে আর্য্যেরা বেদ লিখেছে সে-যুগে কি তা'রা অনার্য্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে নি? স্বয়ং রামচন্দ্র যখন অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে ছিলেন তখন কি তিনি গাছের বল্কল পরে' সীতাদেবীকে আলিঙ্গন কর্তেন—না সীতাদেবী নিজহাতে মোটা চালের ভাত আর তেঁতুল পাতার অম্বল রেঁধে রামচন্দ্রের আধ্যাত্মিকতার গোড়ায় সার দিতেন? গীতা রচনা হ'ল, সে ত একটা ভীষণ মারামারি কাটাকাটির মধ্যে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে যুদ্ধ বিগ্রহ বা ভোগ-বিলাসটা কেবল জড়বাদীদেরই একচেটে ব্যবসা নয়। তা যদি হ'ত তবে এমন আধ্যাত্মিক জাতি যে

হিন্দু তাদের মধ্যে যুদ্ধ ইত্যাদি কর্‌বার জন্যে একটা পৃথক বর্ণই গড়ে' উঠ্‌ত না। আসল কথা হচ্ছে যে যুদ্ধ বিগ্রহ করাই যেমন মানুষের সভ্যতার চিহ্ন নয় তেম্‌নি যুদ্ধ বিগ্রহ না করাটাই মানুষের আধ্যাত্মিকতার পরিচয় নয়। তা যদি হয় তবে এ পৃথিবীতে সবার চাইতে আধ্যাত্মিক হচ্ছে এস্কুইমোরা—কারণ তা'রা যে কোন কালে কারো সঙ্গে যুদ্ধটুদ্ধ করেছে একথা আমরা শুনি নি।

আর একদল আছেন—যাঁরা মনে করেন যে বুক ফুলিয়ে বেড়ানটা আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ নয়—আধ্যাত্মিকতার প্রকৃত লক্ষণ হচ্ছে পিঠ বেঁকিয়ে বসে' থাকা—তাঁরা বলেন ও অনেক সময় বলেও থাকেন যে—ওগো ইয়োরোপের ক'শ বছর চট্‌পট্‌ করে' ছুটে বেড়ান দেখে আপনার বুদ্ধিটাকেও ছট্‌ফট্‌ করে' দৌড়োতে দিও না—বসে' দেখ ধীরে ধীরে ইয়োরোপের কি হয় —সাময়িক ফলাফল দিয়ে কিছুই বিচার কর্‌তে বোসো না— অনন্তকালের তুলনায় ইয়োরোপের এ আস্ফালন জোনাকির দু'মুহূর্ত্তের আলো জ্বালিয়ে উড়ে বেড়ানর মত। একদিন আস্‌বে যখন ইয়োরোপের পতন হবে—তখন ইয়োরোপের সভ্যতা যে জড়-সভ্যতা তা প্রমাণ হ'য়ে যাবে।

ইয়োরোপের হয়ত একদিন পতন হবে কিন্তু তা'তে ইয়োরোপের সভ্যতার জড়সর্ব্বস্বতার প্রমাণ হবে না।

তা যদি হয় তবে আমরা যে একটা ভীষণ আধ্যাত্মিক জাতি এ বুলিটা ত আমরা দিনরাতই রাস্তায় রাস্তায় কপ্‌চিয়ে কপ্‌চিয়ে

বেড়াই কিন্তু আমাদের পতন হ'ল কেন? আমরা এমন নির্জ্জীব হ'য়ে গেলুম কেন? যেমন গ্রীস রোম গিয়েছে তেম্‌নি ইন্দ্রপ্রস্থ হস্তিনাপুর গিয়েছে, মগধ মিথিলা গিয়েছে, উজ্জয়িনী গিয়েছে। আমাদের পুরাণ আছে উপনিষৎ আছে—গ্রীস রোমের হোমার আছে, প্লেটো আরিষ্টটল সক্রেটিস্ আছে, ভার্জ্জিল এসকিলাস্ আছে। প্রভেদটা কোথায়? সুতরাং ইয়োরোপের সভ্যতার পতন হ'লেই যে সেটা জড়সর্ব্বস্ব বলে' মনে কর্‌তে হবে তা'র কোন মানে নেই। কেননা দেখ্‌তে পাচ্ছি আধ্যাত্মিক সভ্যতারও পতন হয়।

এখানে প্রতিপক্ষ সমস্বরে বলে' উঠ্‌বেন যে আমাদের পতন হয়েছে বটে কিন্তু আমরা মরি নি। অপরপক্ষে গ্রীস রোমের পুনর্জ্জীবন লাভের আর কোন আশাই নেই। হিন্দুসভ্যতার জীবন এখনও তলে তলে বহমান—ফল্গুধারার মতো। তা একদিন আবার জেগে উঠে জগৎকে চমৎকৃত করে' দেবে। কিন্তু গ্রীস রোম কোথায়? হয়ত হিন্দু-সভ্যতা একদিন আবার সমস্ত জগৎকে চমৎকৃত করে' দেবে কিন্তু সেটা কোন্ হিন্দুর কোন্ সভ্যতা? সেটা কি ইন্দ্রপ্রস্থ হস্তিনাপুর অযোধ্যার সভ্যতা—না উজ্জয়িনী মিথিলা মগধের সভ্যতা? এই আর একটা আমাদের সনাতন মনের মহৎ দোষ যে আমরা মনে করি যে আমাদের খাস ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় যা কিছু তা'র আর কোনই পরিবর্ত্তন হয় নি—আর হয়ও না। কিন্তু হিন্দুর রামচন্দ্রের আমলের সভ্যতা আর অশোকের যুগের সভ্যতা কি এক? আসল কথা হচ্ছে এই যে

প্রাচীনকাল থেকে যুগে যুগে নতুন নতুন জাতি এসে তাদের নবীন প্রাণের নতুন স্পন্দন চিন্তা ও ভাব দিয়ে এই আমাদের হিন্দুসভ্যতাটার গোড়ায় শক্তি ঢেলেছে। এই সকল জাতির মধ্যে কোন কোনটা হিন্দুর সমাজের সঙ্গে মিশে গেছে—যেমন শক হুন—আবার কোন কোনটা আপনার স্বাতন্ত্র্য বাঁচিয়ে রেখেছে—যেমন পাঠান মোগল ইংরেজ। নতুন নতুন জাতি যুগে যুগে এই রকম করে' ভারতীয় সভ্যতার খনিতে সম্ভার ব'য়ে এনেছে বলে' জরাসন্ধের আমলের হিন্দু-সভ্যতা আর চন্দ্রগুপ্তের আমলের হিন্দু-সভ্যতা এক জাতির ও এক রীতির হ'লেও এক নয়। আর ভবিষ্যতে ভারতের যখন সুদিন আসবে—যেদিন হিন্দু আবার তা'র জ্ঞান প্রতিভা গৌরব ঐশ্বর্য্য দিয়ে জগৎকে চমৎকৃত করে' দেবে—সেদিন যদি ব্যাস বশিষ্ঠকে এরোপ্লেনে চড়িয়ে অমরাবতী থেকে এই মর্ত্ত্যধামে নামিয়ে আনা যায় তবে তাঁরা আমাদেকে দেখে তাঁদের বংশধর বলে' চিন্‌তে পারবেন কি না সে-বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ আছে। সুতরাং আমাদের হিন্দু-সভ্যতা মরে নি এ-কথা বলার পূর্ব্বে এইটে ঠিক করা আগে উচিত যে আসল হিন্দু-সভ্যতাটা কোন্‌টা বা কোন্ যুগের কোন্ হিন্দুর?

এমনি করে' হিন্দু-সভ্যতা যেমন একটা পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে চলে' এসেছে তেম্‌নি গ্রীক ও রোমীয় সভ্যতাও একটা ক্রমোপরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে ব'য়ে গিয়েছে। সেই পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে আজ আমরা যেটাকে পাচ্ছি সেটাকেই আমরা বল্‌ছি ইয়োরোপীয় সভ্যতা—পাশ্চাত্য—এই সভ্যতার

কেন্দ্র হচ্ছে পশ্চিম ইয়োরোপে—বিশেষ করে' প্যারিস লণ্ডন ও বারলিনে। আমরা যেমন রামায়ণ মহাভারতীয় যুগের মানুষের মতো মানুষ নই—অথচ সেই কালের সভ্যতা থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন নই—সেই যুগের হিন্দুর চিন্তা, ভাব ও সত্তার একটা সূক্ষ্ম সংস্পর্শ আমাদের রক্তে রক্তে স্নায়ুতে স্নায়ুতে রয়েছে—তেম্‌নি আজকার ইয়োরোপ যা—তা গ্রীক ও রোমীয় সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। কেবল সভ্যতার কেন্দ্রের পরিবর্ত্তন হয়েছে। ভারতবর্ষেও হিন্দু-সভ্যতার কেন্দ্রের পরিবর্ত্তন ঘটেছে—কখনও বা পাটলিপুত্র কোন সময়ে বা উজ্জয়িনী কখনও বা কান্যকুব্জ। আজকার ইয়োরোপের যে সভ্যতা—তা গ্রীক ও রোমীয় সভ্যতার পরে একটা পরম দাঁড়ি টেনে আরম্ভ হয় নি—এ সভ্যতা তা'তেই জন্মেছে তা'রই জের—শুধু কেন্দ্রের পরিবর্ত্তন হয়েছে মাত্র—এথেন্স রোমের পরিবর্ত্তে আজ আমরা দেখ্‌ছি প্যারিস লণ্ডন। সুতরাং গ্রীস রোম মরেছে আর আমরা মরিনি এ-কথায় আমাদের মনে যতখানি সান্ত্বনা মেলে এতে ততখানি সত্য নেই।

এই কথাটা আজ আমাদের ভাল করে' সত্য করে' বুঝ্‌তে হবে যে জড়বাদ বলে' একটা থিওরি থাক্‌তে পারে কিন্তু কোন সত্য নেই। নাস্তিক ও আস্তিকের মধ্যে একজন ঈশ্বর মানে ও অন্যজন ঈশ্বর মানে না বলে' যে দুজনের জীবন দুটো বিভিন্ন নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তা নয়—তাদের দুজনের জীবনই এ সৃষ্টিতত্ত্বের যে নিগূঢ় সত্যটা তাই দিয়েই পরিচালিত হচ্ছে। তেম্‌নি জড়বাদী হোক্ বা আধ্যাত্মিকবাদী হোক্—তা'রা

যেটাকেই সত্য বলে' মনে করুক তাদের জীবনের গূঢ়তম মূলে রয়েছে একই জিনিষ—একই সত্য—একই তত্ত্ব। এই যে নিগূঢ়তম সৃষ্টির সত্য তা মানুষের কখনও এড়িয়ে চল্‌বার ক্ষমতা নেই—কারণ এ এড়িয়ে যাওয়া মানে মৃত্যু। মানুষ হাজার থিওরি দিয়ে হাজার দর্শন গড়ে' তুল্‌তে পারে—হয়ত সে আজ যা বল্‌ছে কাল ঠিক তা'র উল্টো বল্‌বে—এতদিন যেটাকে সে সত্য বলে' ভেবে এসেছে সেটাকে সে আর একদিন তাহা মিথ্যা বলে' মনে কর্‌বে—কিন্তু তা'তে মানুষের সম্বন্ধে আসল যে সত্যটী তা'র কোন পরিবর্ত্তন হয় না—তা'র কোন ব্যতিক্রম হয় না। সূর্য্য পৃথিবীর চারপাশে ঘুর্‌ছে মনে করি বা পৃথিবীটাই সূর্য্যের চারপাশে ঘুর্‌ছে প্রমাণ করি তা'তে পৃথিবী ও সূর্য্যের যে সত্য সম্বন্ধটা তা চিরকাল একই থাকবে—তা'র কোনই নড়াচড়া হবে না। সুতরাং আধ্যাত্মিকবাদী একদলকে যদি দেখি জীবন-হীন—আর জড়বাদী একদলকে যদি দেখি সজীব—তবে এই মনে কর্‌ব যে আধ্যাত্মিকবাদীরাও আধ্যাত্মিক নয় আর জড়বাদীরাও জড়সর্ব্বস্ব নয়—কারণ একথা আমরা মানি যে জড় মানুষের জীবন দান কর্‌তে পারে না। তখন মনে কর্‌ব যে আধ্যাত্মিক-বাদীর আধ্যাত্মিকতা তা'র মনের থিওরি আর জড়বাদীর জড়-সর্ব্বস্বতাও তা'র বাহিরের একটা রূপ। আর মনের থিওরি—বাহিরের রূপ মানুষের জীবন চালিত করে না—চালিত করে তা'কে তা'র অন্তরের সত্য। আসল মানুষ সে বুদ্ধি দিয়ে কি চিন্তা করে তা নয়—সে অন্তর দিয়ে কি অনুভব করে তাই।

বাহিরের বস্তুসমষ্টি ইয়োরোপকে গড়ে' তোলে নি—ইয়োরোপই বস্তুসমষ্টির জন্ম দিয়েছে—আপনার অন্তরের শক্তিতে—জীবনের আনন্দের আতিশয্যে—প্রাণের গতির বেগে। আমরা যে-চিৎশক্তির ব্যাখ্যা করে' করেই পাঁচ সাত শ বছর কাটিয়ে দিলেম—সে-চিৎশক্তির অনুভব ইয়োরোপের প্রাণে আছে—আমরা যে আনন্দের কথা তুলে হাজার রকম বুদ্ধির কস্‌রত কাগজে কলমে দেখিয়ে জগৎকে মাৎ করতে চাইলেম সে-আনন্দ ইয়োরোপের অন্তরে আছে। এই আনন্দ ও চিৎশক্তির জোরে আজ ইয়োরোপ জগতের শীর্ষস্থানে—তা'র রেলওয়ে টেলিগ্রাফের জোরে নয়—তা'র হাজার রকম ভোগ্যবস্তুর জোরে নয়। রেলওয়ে টেলিগ্রাফের যে সফলতা তা রেলওয়ে টেলিগ্রাফের মধ্যে নেই—আছে ইয়োরোপের মানুষের অন্তরে। নইলে রেলওয়ে টেলিগ্রাফ ত আবিষ্কার হয়েছে অনেক দিন—সেই রেলওয়ে টেলিগ্রাফকে হাতে পেয়ে চীনও তেম্‌নি সফল হ'য়ে উঠ্‌ল না কেন? আসল কথা হচ্ছে যে জড় জড়ই যতক্ষণ না সেটা মানুষের অন্তরের শক্তিতে কার্য্যকরী হ'য়ে ওঠে।

সুতরাং ইয়োরোপ আজ যা, তা'র মূল কারণ হচ্ছে তা'র ঐ জীবনে অনুভূত আনন্দ—প্রাণে ওজস্‌রূপিণী চিৎশক্তি—তা'র জীবন-দেবতার এ ভগবানের সৃষ্টিতে লীলা-বিলাস। আর এ সৃষ্টিতে লীলা-বিলাস মানেই হচ্ছে ভোগ কর্ম্ম—শব্দ গন্ধ রূপ রসের সঙ্গে দিবানিশি আপনার হৃদয় বিনিময়। ইয়োরোপের পতন হবে সেইদিন প্রকৃতপক্ষে যেদিন তা'র প্রাণে তা'র অন্তরে

ঐ চিৎশক্তি ঐ আনন্দের অভাব হবে—যেদিন তা'র জীবন-দেবতার মন্দিরে ঐ লীলা-বিলাসের পরিবর্ত্তে বৈরাগ্য-বিলাস সত্য হ'য়ে উঠ্‌বে। আর ব্রহ্মানন্দ যেমন আধ্যাত্মিক—জীবন-দেবতার এই আনন্দ প্রাণের এই চিৎও তেম্‌নি আধ্যাত্মিক। তবে ইয়োরোপের শুধু দোষ এই যে তা'রা এ-সব কথা ঠিক ঠিক গুছিয়ে বল্‌বার এ পর্য্যন্ত চেষ্টা করে নি—আমাদের মতো এ-সব জিনিষ ব্যাখ্যা কর্‌তে তা'রা তেমন পটু হ'য়ে ওঠে নি।

পরিশেষে একটা কথা বল্‌ব কথাটা হচ্ছে এই যে—আমরা সবাই বিশ্বাস করি ভারতবর্ষ আবার জগতে আপনার পূর্ব্ব-গৌরবের স্থান অধিকার করে' বস্‌বে। কিন্তু কেউ যদি মনে করে' থাকেন যে সেদিন হিন্দু তাঁতীরা কেবল গেরুয়া কাপড় তাঁতে চড়াবে আর হিন্দু চাষীরা কেবল অপক্ক কদলীর চাষ কর্‌বে তবে তাঁরা নিরাশ হবেন নিশ্চয়—সে-কথা আগে থাক্‌তেই বলে' রাখ্‌ছি।

প্রাণের দায়

আজকার পৃথিবীতে যে-সব জাতি শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করে' রয়েছে তাদের আর আমাদের মধ্যে একটা প্রভেদ এই যে তাদের বেঁচে থাকার মধ্যে মানের দায়টা বেশী আর আমাদের বেঁচে থাকার মধ্যে প্রাণের দায়টা বেশী—আর এই প্রাণের দায় ও মানের দায়ে এই প্রভেদ যে যেখানে মানের দায় আছে সেখানে প্রাণ আস্‌বেই আর যেখানে প্রাণের দায় আছে সেখানে মান খস্‌বেই। তাই আজ আমাদের কোন মান নেই কিন্তু সেইসব শ্রেষ্ঠ জাতির দিব্যি প্রাণ আছে।

বিষয়টা যদি এখানেই শেষ হ'য়ে যেত তবে কোন কথা ছিল না। কিন্তু যেদিন থেকে এই প্রাণের দায় আমাদেকে আশ্রয় করেছে সেদিন থেকে এমন কতগুলো সদ্‌গুণ আমাদেকে নিরাশ্রয় করে' চলে গেছে যে সেজন্যে এখন জগতে আমাদের ভদ্রতা রক্ষা করে' বাস করা কঠিন হ'য়ে উঠেছে। আর সেই জন্যেই এ সম্বন্ধে শুধু দু'এক কথা নয়, হাজার হাজার কথা বলে' দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত তোলপাড় করে' তোলা উচিত। কারণ তোলপাড়ের আর যে-কোন দোষই থাক্‌

না কেন এর একটা মস্ত গুণ এই যে তা মানুষকে কখন বসে' থাকৃতে দেয় না—ঘরের কোণেও না, মনের কোণেও না। আর আমরা ঘরের কোণে ও মনের কোণে এম্‌নি করে' এত-কাল বসে' ছিলেম যে তা'তে আমাদের শরীরে ও মনে পক্ষাঘাত দেখা দিয়েছে। এখন সময় থাকৃতে থাকৃতে আমাদেকে উঠে দাঁড়াতে হবে, একটু চলা ফেরা কর্‌তে হবে—এমন কি একটু দৌড়ধাপ কর্‌লেও কোন দোষ হবে না—সেটা প্রথম প্রথম যতই অশোভন যতই হাস্যকর হোক্ না কেন এর পরিণাম ফল শুভ হ'তে বাধ্য। কারণ মানুষ স্থাবর নয়—মানুষ হচ্ছে জঙ্গম—মানুষের ধর্ম্মই হচ্ছে চলা—ভিতরে ও বাহিরে। আর ধর্ম্মেই যে শুভ ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে একথা বোধ হয় কোন সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত না করেও আজ বাংলাদেশে নিরাপদে বলা চল্‌তে পারে। এই প্রাণের দায়কে আশ্রয় করে' আজ আমাদের কর্ম্মও গিয়েছে, ভোগও গিয়েছে, যায়নি শুধু কর্ম্মভোগ। কারণ কোন মানুষই কর্ম্মকে আর ভোগকে এড়াতে পারে না। যে এ-দুটোকে এড়াতে চাইবে তা'র কাছেই ঐ দুটো একসঙ্গে হ'য়ে কর্ম্মভোগরূপে দেখা দেবে। এ কথাটা ব্যক্তিগত হিসেবে যতটা না খাটুক জাতি হিসেবে এ-কথাটা একেবারে সুদে আসলে খাটে। প্রমাণ—আমরা।

এই যে মানের দায় তা আমাদের যে কোন্ দিন খস্‌ল তা ঠিক করে' বলা মুস্কিল, কিন্তু এই প্রাণের দায় যে কোন্ দিন থেকে আমাদেকে আশ্রয় কর্‌ল তা'র একটা আন্দাজ

করা তত কঠিন নয়, কারণ তা'র একটা চিহ্ন আমাদের জাতির মনের গায় বেশ ফুটে উঠেছিল তা'র সঙ্গে সঙ্গেই। সে-চিহ্নটা হচ্ছে এই যে, যেদিন থেকে আমরা একটু বেশী রকম আধ্যাত্মিক হ'য়ে জগৎটাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে কোমর বেঁধে লেগে গেলেম।

কারণ আর যাই হোক্ না কেন হিন্দুর সূক্ষ্মবুদ্ধির মারপ্যাচ যেমন তেমন আর কারো নয়। এই প্রাণের দায়ের সঙ্গে সঙ্গে জীবনটা যখন গলগ্রহ হ'য়ে উঠ্‌ল, সংসার যাত্রাটাও তখন অসুখের হ'য়ে পড়্‌ল। আর তখন আমাদের দেশটাও ছেয়ে গেল তাদের দ্বারা—যাদের নাড়ীতে নাড়ীতে প্রাণের স্পন্দন মিনিটে মিনিটে একশ তিরিশ বার করে' টক্ টক্ করে' বেরিয়ে আস্‌বার জন্যে তাগিদ্ দিচ্ছে—যাদের হৃদয়টা জগতের রঙে রঙীন হ'য়ে উঠেছে—যাঁদের বেঁচে সুখ, মরে সুখ—কর্ম্মে আরাম, ভোগে আনন্দ। আমাদের কর্ম্ম ভোগ অধিকার করে' বস্‌ল তা'রা—আমাদের ধন জন কাজে লাগা'ল তা'রা—আমাদের মন প্রাণকে দাস করে' আপনাদের কার্য্য সিদ্ধ কর্‌তে লাগ্‌ল তা'রা। কিন্তু বলেছি হিন্দুর সূক্ষ্মবুদ্ধির মারপ্যাচের কথা। সে ভুল্‌তে পারে নি যে তা'র পূর্ব্বপুরুষ একদিন বড় ছিল—তা'রা সিংহল বিজয় করেছিল, বালি জাভায় উপনিবেশ গেড়েছিল। তাদেরি সভ্যতা মিশরে, মিশর থেকে ক্রীটে, ক্রীট থেকে গ্রীসে, গ্রীস থেকে রোমে, রোম থেকে সমস্ত ইয়োরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। আর তাদেরি বংশধর যারা তা'রা কি ছোট? না,

কিছুতেই না। তা'রা বল্‌লে—ওগো আমাদের এমন চেহারা দেখে তোমরা ভুল বুঝো না। আমরাও বড়—খুব বড়—বিন্ধ্যগিরির চাইতেও বড়। হিমাদ্রির চাইতেও বড়। তবে এখানে নয়। আমরা বড় সেইখানে—সেই সত্যলোকে। যেখানে আত্মা দেহ ছেড়ে দিব্যি বেড়িয়ে বেড়ায়। আমাদের যে আজ ষত্ব ণত্ব জ্ঞান লোপ পেয়েছে তা'র মানে যে আজ আমরা বেজায় রকমের সত্ত্ব। আমরা যে আজ কর্ম্মের ও ভোগের ধার ধারি না, তা'র কারণ যে আজ আমরা বেজায় আনন্দে আছি। ব্রহ্মতেজে যে আজ আমাদের ললাট থেকে আগুনের শিখা বেরিয়ে আসে না, তা'র মানে যে আমরা ক্ষমাশীলতার শীতলতা দিয়ে সে শিখাকে নিভিয়ে দিয়েছি—কি জানি যদি কেউ তা'তে পুড়ে যায়। আমরা ঘোর রকমের আধ্যাত্মিক বুঝ্‌লে হে? আরও একটা গোপন কথা বলি শোন—এই যে দেখ্‌ছ জগৎটা এটা একটা ভেল্কি—তাই ত আমরা ওটার দিকে বড় একটা দৃষ্টি দিই নে। আসল কথা আমরা ওর ওপরে উঠে গেছি। আমরা আজ ভীষণ রকম বড়।

কিন্তু জগৎটা এম্‌নি বোকা যে আমাদের এ-কথা কেউ মান্‌তে চায় না। ও-কথা শুনে কেউ কেউ আমাদের পানে আড়চোখে চেয়ে চেয়ে একটু মুচ্‌কে হেসে চলে' গেল। কেউ বা ভাব্‌লে আমরা পরিহাস কর্‌ছি। আবার সহৃদয় দু'এক জনা মুরুব্বিয়ানা দেখিয়ে বল্‌লে—হাঁ হাঁ তোমরা বড় বটে—আর সেটা, তোমরা জন্মাবার চার পাঁচ হাজার বছর পূর্ব্বে যে-সব বই লেখা হ'য়েছে,

যে-বইগুলো তোমাদের মধ্যে হাজার করা একজনা পড়্‌তে পারে —লক্ষ করা আধজনা বুঝ্‌তে পারে—সেই বইগুলো থেকে সূত্র তুলে' প্রমাণ করাও যায় বটে। জগতের লোকগুলোর এই ভাবভঙ্গী দেখে আমাদের সন্দেহ পর্য্যন্ত রইল না যে জগতের লোকগুলো সব ভীষণ রকম অজ্ঞানান্ধকারে—এম্‌নি কালো সে আঁধার যে একেবারে আল্‌কাতরার চাইতেও কালো। আর জগতের মধ্যে একলা জ্ঞানী শুধু আমরা। সেদিন থেকে আমরা বসে' রয়েছি সেই দিনের অপেক্ষায় যেদিন পরলোকে ব্রহ্মার এজ্‌লাসে বিষ্ণু মহেশ্বরকে এসেসার ধ'রে বিচারে প্রমাণ হ'য়ে যাবে যে আমরাই শ্রেষ্ঠ।

আমাদের সংস্কৃত গ্রন্থসমূহে জগৎ ঈশ্বর লীলা—এসম্বন্ধে যে কত মত আছে তা'র বোধ হয় ঠিক নেই। কিন্তু আমাদের জাতির মনের কাছটায় যে "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা" "মায়াবাদ" প্রভৃতি মতগুলোই সত্য হ'য়ে উঠ্‌ল এরও কারণ ওই প্রাণের দায়। কারণ মানুষ ভিতরের সঙ্গে থাপ না খেলে কোন কিছুকেই সত্য বলে' গ্রহণ করতে পারে না। ভগবান ত সত্য কিন্তু নাস্তিকের কাছে ভগবান এমন স্পষ্ট রকমের অসত্য যে ভগবান যারা মানে তাদের অজ্ঞতা দেখে সে আশ্চর্য্য। যদি কোন জাপানীকে বলা যায়—ওহে, এ সব কি কর্‌ছ। এ জগৎটা সব মিথ্যা। তবে সে নিশ্চয় উত্তর দেবে—হ'তে পারে তোমার জগৎটা মিথ্যা। কিন্তু আমার অন্তরে অদম্য বেগে যে প্রাণের স্পন্দন খেল্‌ছে সেটা ভীষণ রকম সত্যি। সেটা এমন স্পষ্ট রকমের সত্যি যে সে-সম্বন্ধে

আর আমার ভুল কর্‌বার কোন সম্ভাবনাই নেই। আর এই প্রাণের স্পন্দনের এম্‌নি তেজ যে এর আলো লেগে এ জগতটার যে রূপ খুলেছে তা'তে আমি এম্‌নি মুগ্ধ হ'য়ে গেছি যে তা'তে করে' ভগবানকে স্পষ্টতর করেই দেখ্‌ছি। জগতের এ রূপ যদি তোমার চোখে পড়ে' না থাকে তবে মস্ত অলাভ তোমার, ক্ষতি আমার নয়। তোমার হাত পা চোখ্‌ কানগুলো যদি তোমার আনন্দের কারণ না হ'য়ে তোমার বোঝার মত হয়—কর্ম্ম করে' যদি আরামের পরিবর্ত্তে শুধু বেদনাই পাও—ভোগ করে' যদি পাপ অর্জ্জন কর্‌ছ বলেই মনে হ'তে থাকে তবে দুর্ভাগ্য তোমার—দোষ জগতেরও নয় ভগবানেরও নয়। এর উত্তরে মায়াবাদী যাই বলুন না কেন—যত পুরাতন সংস্কৃত শ্লোকই হাজির করুন না কেন এর পিছনে রয়েছে ওই প্রাণের দায়। কারণ আমাদের ঋষিদের চিন্তা এত বিভিন্নমুখীন, এমন বিচিত্র ছিল যে এমন কোন মত নেই যেটা তাঁদের কারো-না-কারো বাক্য দিয়ে সমর্থন করা না যায়। এ সত্বেও যে মায়াবাদীর লোলুপদৃষ্টি যে শ্লোকগুলো "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা" বল্‌ছে সেই শ্লোকগুলোর মাঝেই আট্‌কে রইল, তা'র মানেই হচ্ছে এই যে তা'র নিজের প্রাণের অবস্থাটা বড় সঙ্গীন।

সুতরাং আমাদেকে আমাদের এই প্রাণ জিনিষটাকে জাগিয়ে তুল্‌তে হবে। কারণ এই প্রাণ জিনিষটার এম্‌নি গুণ যে এর সাহচর্য্যে আমাদের হাত পা চোখ কানগুলো সব একচোটে এক-বারে হালকা' হ'য়ে যাবে। কেবল তাই নয়। এই প্রাণের

স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে দেখ্‌ব যে এ জগতটাও একটা অপরূপ সাজ সেজে আমাদের চোখে ধরা দিয়েছে। তখন দেখ্‌ব যে জগতটা মিথ্যা হওয়ার চাইতে সেটা সত্য হওয়ায় আনন্দ হয় অনেক বেশী। তখন বুঝ্‌ব যে আমরাই সবার চাইতে বুদ্ধিমান নই—বুদ্ধিমান তা'রা যারা মানুষকে স্বীকার করেছে, জগতকে স্বীকার করেছে। যখন মানুষের দেহ প্রাণ ভরপুর হ'য়ে উঠ্‌বে তখন বুঝ্‌ব যে তা'র প্রত্যেক পাদক্ষেপে আনন্দ রয়েছে—তা'র প্রত্যেক কর্ম্ম, প্রত্যেক আশা, প্রত্যেক আকাঙ্খায় একটা সার্থকতা রয়েছে—এমন কি তা'র প্রত্যেক ব্যর্থতায় একটা তৃপ্তি রয়েছে। আর তা'তে মানুষের মঙ্গল আস্‌বে, সমাজের মঙ্গল আস্‌বে, জাতির মঙ্গল আস্‌বে, দেশের মঙ্গল আস্‌বে সুতরাং জগতেরও কল্যাণ হবে।

অধমের কথা

১

"এডুকেশন গেজেটে" "শ্রেয় ও প্রেয়" নাম দিয়ে একখানা চিঠি ছাপা হয়েছে। চিঠি লেখক এক জায়গায় লিখেছেন আমরা অধম লোক ; আমরা অধম লোক এ যেন বিনয়ের ধর্ম্মশীলতার পরাকাষ্ঠা এ যেন শ্রেয়েরই পথ। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা কর্‌তে চাই কেন এই মনের ভাব যে আমরা অধম লোক। যে-জাত সোঽহম্ পর্য্যন্ত বল্‌তে কুণ্ঠিত হয় নি যে-সোঽহম্ আসুরিক সোঽহম্ নয়, জার্ম্মাণ কৈজরের সোঽহম্ নয়—এ সোঽহম্ জ্ঞানে উদ্দীপ্ত প্রেমে অভিষিক্ত আনন্দে অনির্ব্বচনীয়—সেই জাতির মধ্যে কেন এই প্রকার লোকের জন্ম হ'ল, লক্ষ করা ন'হাজার ন'শ নিরানব্বই জনের আবির্ভাব হ'ল যারা দিনরাত খালি ভাব্‌ছে "আমরা অধম লোক"। কেন এমন হ'ল? আমগাছে আমড়া ফল্‌ল কেন? জ্ঞানের নদী শুকিয়ে উঠ্‌ল কেন? শক্তির ধারা শাস্ত্রের বালিতে লুকিয়ে গেল কেন? রইল সেখানে কেবল দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত অধম মানুষের পাল—তাদের জীবনব্যাপী হা-হুতাশের সমষ্টি—তাদের আজীবনের মানসিক ভীত? কেন এমন হ'ল? কোন্ পাপে এমন হ'ল?

কোন্ মিথ্যার আশ্রয়ে এমন হ'ল ? এ প্রশ্ন মনে আপনা আপনি ওঠে।

অবশ্য এর প্রধান কারণ হচ্ছে যে বাস্তবিকই আমরা ভিতরে অধম হয়েছিলেম। ভিতরে অধম হ'য়ে বাহিরে পরিত্রাহি চীৎকারে আমরা শতাব্দী শতাব্দী ধরে' অধমতারণকে ডেকেছি। আজও আমাদের শিক্ষা হ'ল না যে ভগবান অধম গড়্বার জন্যে জগৎ গড়েন নি—তিনি অধমকে তারণ করেন না—তা'কে তাড়না করেন—উত্তম কর্বার জন্যে। তাঁর চেষ্টা নিশিদিন মানুষকে এই কথা বলাতে যে "তরিতে পারি শকতি যেন রয়"।

ভিতরে অধম হ'য়ে আমরা থেমে রইলাম না—কারণ অধম হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অহঙ্কার মরে নি। তাই আমরা প্রমাণ কর্তে বস্লেম যে মানুষের এই যে অধম অবস্থা সে অতি মহৎ অবস্থা। আমরা প্রমাণ কর্তে চাই যে, আমাদের এই দীনতা মানসিক হীনতা থেকে উৎপন্ন হয় নি—উৎপন্ন হয়েছে তা আধ্যাত্মিক উচ্চতা হ'তে।

তাই এই দীনতা, আমাদের মনের এই অধম অবস্থা তাড়িয়ে দেওয়া দূরে থাক্ তা আমাদের জাতীয়-জীবনের স্থায়ী সম্পদ কর্বার জন্যে যত আয়োজন সম্ভব তা করে' আমাদের মনের চারপাশে সাজিয়ে দিয়েছি। এই দীনতা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে মানুষের অধমত্বকে তাড়িয়ে তা'কে আত্মবান শক্তিমান কর্বার জন্যে আজ স্পষ্ট করে' এই কথাটা আমাদেকে বল্তে হবে যে—শ্রেয়ে আর প্রেয়ে কোন বিরোধ নেই। যেখানে এই বিরোধ আছে

সেখানে মানুষ ব্যর্থ—তা'র কর্ম্ম অসত্য—তা'র ধর্ম্ম প্রাণহীন—তা'র জীবন একটা বিরাট ব্যঙ্গ। যদি বল যে মানুষের দীনতার সঙ্গে তা'র জীবনের শ্রেয় ও প্রেয়ের বিরোধের তর্কের সম্বন্ধ কি? সম্বন্ধ আছে। আমরা শ্রেয়কে আশ্রয় করে' জীবনে মিথ্যার ভিতর দিয়ে অমৃত পাবার চেষ্টা অনেক দিন করে' এসেছি। এই মিথ্যার চরম পরিণতি দেখ্‌তে পাওয়া যায় আমাদের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের ঊর্দ্ধবাহুতে অঘোরপন্থীতে। যে-হাতখানার সত্য হচ্ছে স্কন্ধ থেকে নীচে নেমে আসা সে-হাতখানাকে আমরা উঁচু করে' রেখে শুকিয়ে ফেলে মনে কর্‌লেম তা'তে ভগবান প্রসন্ন হ'য়ে উঠ্‌ছেন। সুতরাং আমাদের আজ প্রমাণ কর্‌তে হবে যে হাতখানার নীচু দিকে নামাই হচ্ছে মানুষের পক্ষে প্রেয়, সেটাই তা'র সত্য—আর সেটাই শ্রেয়। শ্রেয়ে আর প্রেয়ে বাস্তবিকই কোন বিরোধ নেই—মানুষের কর্ম্মজীবনেও না—ধর্ম্মজীবনেও না।

এই যে জীবনের প্রতি অনাদর এর চাইতে বড় ব্যাধি মানুষের আর কিছু নেই কেননা এর চাইতে বড় মিথ্যা আর কিছু নেই। এই ব্যাধি আমাদের বেড়েই চল্‌ল, কেননা আমরা আমাদের জীবনের চার পাশে শ্রেয়ের স্তূপ দিয়ে এমনি করে' তুল্‌লেম যে আমাদের জীবনটা ধীরে ধীরে খেলা থেকে হ'য়ে উঠ্‌ল কর্ত্তব্য—প্রাণের সহজ সত্য গতিভঙ্গিমা থেকে হ'য়ে দাঁড়াল শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধি-ব্যবস্থার সার্কাসী কস্‌রত। সুতরাং এমন কস্‌রত থেকে ছুটি কে না চায়—সারা জীবন কেবল কর্ত্তব্যই করে' করে' অনন্ত অবসর কে না আকাঙ্খা করে? তাই আর যাতে জন্ম জন্মান্তর

ফিরে আস্‌তে না হয় তা'র জন্যে আমরা কেউ উর্দ্ধবাহু হ'য়ে রইলেম—কেউ বা পেরেকমারা তক্তার ওপরে চিত হ'য়ে শুয়েই জীবনটা কাটিয়ে দিলেম—মৃত্যুর পর নির্ব্বাণ যাতে লাভ হয়। কারণ এ জীবন যে আমাদের কেবল কর্ত্তব্য কেবল শ্রেয়—তাই পালাবার চেষ্টা। সারাজীবন এই প্রেয়শূন্য আনন্দহীন কর্ত্তব্য করে' আমাদের ঠিক যে মানসিক ভাবটা হয় সেটা হচ্ছে ঐ "আমরা অধম লোক"। কেননা আনন্দহীন প্রেয়শূন্য কর্ত্তব্য হচ্ছে দাসত্ব। আর দাসত্ব কোন মানুষকে উত্তম করে না, তা সে দাসত্ব কোন মানুষেরই হোক্‌ বা কোন কর্ম্মেরই হোক্‌। মানুষের দাসত্ব বরং ভাল কারণ সেখানে মনে মনেও আমরা বিদ্রোহ করি —কিন্তু বিধি-নির্দ্দিষ্ট কোন কর্ম্মের দাসত্ব তা'র চাইতে ভয়ানক; কারণ এখানকার দাসত্বটা আমাদের চোখে পড়ে না, সুতরাং বিদ্রোহের কথাটা মনেও ওঠে না—যে-কথাটা মনে ওঠে সেটা হচ্ছে ঐ "আমরা অধম লোক"।

এ থেকে আমরা মুক্তি চাই—দেশের কল্যাণের জন্য, জাতির কল্যাণের জন্য, মানুষের কল্যাণের জন্য, সুতরাং আমাদের শ্রেয় ও প্রেয়ের বিরোধ মেটাতে হবে। জীবনে প্রেয়কে অভিনন্দিত কর্‌তে হবে জীবনে শ্রেয়কে প্রেয় করে' তুল্‌তে হবে।

মানুষ যে বেঁচে আছে সেটা শ্রেয় বলে' নয় সেটা প্রেয় বলে'। মানুষে যেখানে যা কিছু কর্‌ছে তা'র প্রথম কথাটা হচ্ছে যে তা প্রেয়। মানুষ নিশ্বাস নিচ্ছে, বাঁচবার জন্যে খাচ্ছে, শ্রান্তিদূর কর্‌বার জন্যে ঘুমুচ্ছে, শক্তি অনুভব করে' কর্ম্ম কর্‌ছে—এর

প্রত্যেকের পিছনে রয়েছে প্রেয়। প্রেমিক প্রেমিকার জন্যে জীবন দিচ্ছে সহস্র যুবক সমাজের জন্যে জাতির জন্যে দেশের জন্যে জীবন উৎসর্গ করে' দিচ্ছে, দিয়ে তা'র মধ্যেই সে অমৃত পাচ্ছে কারণ তা প্রেয়। মাতা সন্তানকে স্তন দিচ্ছেন শ্রেয় বলে? না— মাতৃমনের তা'র চাইতে স্পষ্ট সত্য হচ্ছে যে তা প্রেয়। পিতা পুত্রকে পালন করছেন শ্রেয় বলে'? সমাজ বল্‌বে পুত্রকে পিতার পালন করা শ্রেয় বা কর্ত্তব্য। কিন্তু পুত্রকে পালন করা পিতার প্রেয় বলেই যুগে যুগে ঐ কর্ত্তব্য বা প্রেয় সাধিত হ'য়ে আস্‌ছে। পিতামাতাকে যদি পুত্রপালন কেবল শ্রেয় বলে' কিংবা কর্ত্তব্য বলে' কর্‌তে হ'ত তবে সেটা পিতামাতার ওপরে ভালবাসার এম্‌নি জুলুম বলে' ধরা পড়্‌ত যে বহু আগে জগতের পিতামাতা-দের মধ্যে এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জেগে উঠ্‌ত। কিন্তু ঐ যে পালন তা পিতামাতার পক্ষে প্রেয় কেন? কারণ পিতা মাতার অন্তরে সন্তানের প্রতি প্রেম রয়েছে বলে'। আর যেখানে প্রেম আছে সেখানেই আনন্দ আছে। আর যাতে আনন্দ আছে তাই প্রেয়। আর এই সৃষ্টির আসল গোড়াকার কথাটা হচ্ছে ঐ আনন্দ। এ জগতকে ভগবান সৃষ্টি করেন নি দশ হাজার বৎসর কৃচ্ছ্রতা সাধন করে'—করেছেন তা তাঁর স্বত-উচ্ছ্বসিত আনন্দ থেকে। মানুষের জীবনের অতি অন্তরতম কথাটাও হচ্ছে তাই।

এই প্রেয়কে আমরা জীবনে পাই কখন? যখন সত্যকে পাই। কারণ মিথ্যাই হচ্ছে দুঃখ। চোখ দুটাকে যখন বুঁজে রাখি তখনই কৃচ্ছ্রতা, তখনই দুঃখ। কারণ চোখ দুটো ত বুঁজে

রাখ্‌বার জন্যে হয় নি হয়েছে তা খুলে রাখ্‌বার জন্যে ? আর চোখ দুটো খুলে রাখ্‌লে আমাদের হয় কি ? দুঃখ ? পাপ ? না, তা'তে হয় সুখ, তা'তে হয় আনন্দ, সেটাই প্রেয় কারণ সেইটিই চোখের সত্য আর তা'তেই মঙ্গল। পা দুটোকে বেঁধে না রেখে চল্‌তে দেওয়াই তা'র সত্য, চল্‌তে দিলেই তা'র সার্থকতা। যখন বেঁধে রাখি তখনই কৃচ্ছ্রতা তখনই দুঃখ—কারণ ঐটেই যে পায়ের মিথ্যা। আর পা দুটোকে চল্‌তে দিলেই, চোখ দুটোকে খুলে রাখ্‌লেই যে মনের গায়ে খোস পাঁচড়া উঠ্‌তে বাধ্য সেটাই কোন্ "মেডিকেল সায়েন্সে" বলে ? বা কোন্ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে লেখে ?

কিন্তু মানুষ যখন তা'র যা সত্য সেই সত্য পথকে ত্যাগ করে' অসত্য আশ্রয় করে, তখন সে তা'র জীবন-দেবতার সত্য শক্তিকে ব্যাহত করে, সঙ্গে সঙ্গে সে নিরর্থক হ'য়ে উঠ্‌তে থাকে—তখন সে দেখে কই এতে ত আনন্দ নেই। তখন দর্শনের পৃষ্ঠা উল্টিয়ে সান্ত্বনা পেতে চেষ্টা করে এই বলে' যে এখন আনন্দ নেই বটে কিন্তু তা'র ফলে জীবনে সে পরিণামে এমন এক জিনিষ লাভ কর্‌বে যার জোরে সে একেবারে ডবল প্রমোশন পেয়ে কুণ্ঠাবিহীন হ'য়ে বৈকুণ্ঠে গিয়ে পৌছোবে। কুণ্ঠাবিহীন যে সে হবে তা'তে কোন ভুল নেই তবে সে বৈকুণ্ঠে পৌছোবে কিনা সেটা তর্কের বিষয়। কেননা বৈকুণ্ঠ জায়গাটা কোন ভূগোল-শাস্ত্রের কথা নয় —সেটা হচ্ছে মনোজগতের বা আধ্যাত্মিক জগতের একটা অবস্থা —আর সেটা লাভ হ'য়ে থাকে মর্‌বার পরে নয় মর্‌বার আগেই। আর আধ্যাত্মিক জগতের যে বৈকুণ্ঠ সেটা অধম বা অক্ষমদের জন্য

তৈরী হয়নি—তা উপনিষদ্ থেকে শ্লোক তুলে' প্রমাণ করা যেতে পারে।

এম্‌নি করে' কেবল চোখ পা'ই নয়—মানুষের সমস্ত—তা'র হাত পা চোখ কাণ নাক—তা'র কর্ম্মেন্দ্রিয় ভোগেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় সবকে যখন মানুষ সত্য করে' পায়, তখন দেখ্‌তে পায় সেই সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে—সেই সকল ইন্দ্রিয়ের সত্যের মধ্যে একটা স্বত-উচ্ছ্বসিত আনন্দপ্রবাহ অনাদি কাল থেকে রয়েছে। মানুষ যখন ভয় না পেয়ে আপনাকে অধম বিবেচনা না করে' এই আনন্দ প্রবাহকে আপনার করে' নেয়, যখন সে সেই সকল ইন্দ্রিয়ের আনন্দকে আপনার বেগে আপনার সত্যে ছুট্‌তে দেয় ফুট্‌তে দেয় তখন সে দেখ্‌তে পায় যে এ জীবনটা শুধু প্রেয়—আর প্রেয়—আর প্রেয়। ঐ প্রেয়ে, ঐ সুখে, ঐ ভোগে তা'র কোন পাপ নেই, কোন অনিষ্ট নেই। কারণ ঐ যে আমাদের জীবনের লীলাময়ের সত্য—তা'র জন্য দায়ী সেই ভগবান। এই সত্য উদ্ভূত আনন্দ থেকে। যেহেতু উদ্ভূত আনন্দ থেকে সুতরাং তা প্রেয়।

তবে কি মানুষের জীবনে কৃচ্ছ্রতার কোন স্থান নেই? না, নেই। তবে যুবক সিদ্ধার্থ এত বর্ষ ধরে' কৃচ্ছ্রতা সাধন কর্‌লেন কেন? কিন্তু কৃচ্ছ্রতা কা'কে বল? সিদ্ধার্থের কৃচ্ছ্রতা সে বাহিরের দিকের কৃচ্ছ্রতা—আমাদের চোখের দেখা কৃচ্ছ্রতা। আমরা, যাদের মন বিলাস ঐশ্বর্য্যে ঘোর রকমে আসক্ত, সেই আমাদের চোখে তা কৃচ্ছ্রতা বলে' প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বিরাট ঐশ্বর্য্য ত্যাগে যুবক সিদ্ধার্থের জীবন-দেবতার একটা প্রবল আনন্দ ছিল—

তা'র বর্ষ-বর্ষ-ব্যাপী তপস্যার প্রত্যেক নিমেষটী সন্তোষময় ছিল। কারণ ত্যাগই ছিল তাঁর জীবনদেবতার অন্তরতম সত্য। আর তাই সিদ্ধার্থ অনাহারে অনিদ্রায় বোধি-বৃক্ষ তলে তপস্যার পর— হ'য়ে উঠেছিলেন বুদ্ধ—নইলে তিনি হ'য়ে উঠ্‌তেন শুধু বৃদ্ধ। সত্যের ভিতর দিয়েই তিনি অমৃতে পৌছিয়েছিলেন—আনন্দের ভিতর দিয়েই তিনি আনন্দে গিয়েছিলেন। আমরা শুধু বাইরের চেহারা দেখে ভুল বুঝি ও ভুল করি।

ভগবানের আনন্দ অনন্তরূপে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ পেয়েছে। তা'র কোথায়ও দিগন্তে-বিলীন ধু ধু ধূসর কঙ্কালসদৃশ মরুভূমি, আবার কোথায়ও কল-কল ছল-ছল-ভাষী বিভঙ্গ ঊর্ম্মি-গতি-রঞ্জিত নীলাব্জ পারাবার। তেম্‌নি মানুষের জীবন-দেবতার আনন্দেরও অনন্ত রূপ। এই অনন্তরূপেরই একটি রূপ হচ্ছে ত্যাগ। অগণ্য মানুষের অন্তরে এই আনন্দ অগণ্য রূপ নিয়ে ফুটে উঠ্‌ছে। এই অনন্তরূপের কোনটাই ছোট নয়—কোনটাই ব্যর্থ নয়। সেই কথাটাই আমরা ভুলে গিয়ে সিদ্ধার্থের জীবন-দেবতার যে সত্য যে ধর্ম্ম সেই ধর্ম্মটী ত্রিশকোটী ভারতবাসীর কাঁধে চাপিয়ে দিতে যত্ন করেছি। ফলে আমরা কেউই বুদ্ধ হ'য়ে উঠিনি —হ'য়ে উঠেছি—"আমরা অধম লোক"!

যাঁরই কলমের আগা দিয়ে বের হয়—"আমরা অধম লোক"—তাঁরই মনের মালায় স্পষ্ট করে' রূপ হ'তে বাধ্য—"আমার মরণ হোক্!" কারণ জীবনের আনন্দ তিনি অনুভব করেন নি। জীবনের আনন্দ—যা বর্ষাপরিপ্লাবিতা সাগরাভিসারিকা স্রোত-

স্বিনীর মতো আপনার প্রাচুর্য্যে আপ্‌নিই উচ্ছ্বসিত, আপনার গতিতে আপ্‌নিই চঞ্চল, আপনার প্রাণের বেগে আপ্‌নিই মুখর। জীবনের এই আনন্দের অনুভব যখন মনে প্রাণে সত্য হ'য়ে ওঠে তখন মানুষ দেখে যে সে অধম নয় অক্ষম নয় সে অবিনশ্বর অক্ষয় —কারণ তা'র জীবনের এই আনন্দ সেই পরমানন্দেরই একটি ধারা সেই ব্রহ্মানন্দেরই একটি সুর—যে আনন্দের সুর আপনাকে এই পৃথিবীতে সহস্র রূপে সহস্র নামে সার্থক করে' তুল্‌ছে।

জীবনের এই আনন্দের বাণীই আমরা আজ দেশবাসীকে শুনিয়ে দিতে চাই—স্পষ্ট করে' অকুণ্ঠিতচিত্তে অকম্পিত স্বরে। সেইজন্যে আজ আমরা ডাক্‌ছি—হে তরুণ, হে নবীন, অতীতের চিন্তার বাতাসে যাদের সবুজ মন হল্‌দে হ'য়ে ওঠে নি—বাংলার সেই তরুণ ও নবীনকে ডেকে বল্‌ছি—হে তরুণ, শাস্ত্রকে মানার চাইতে বড় হচ্ছে আপনাকে জানা। আপনাকে জান—আপনার অন্তরদেবতার আহ্বান কান পেতে শোনো—সেই অন্তর-দেবতা যে পথে যেতে ইঙ্গিত করে সেই পথ ধরে' চলে যাও, দেখ্‌বে তখন প্রতি পদক্ষেপে তোমার আনন্দ রয়েছে, জীবনের প্রতি নিমেষে তোমার সার্থকতা রয়েছে, প্রতি ব্যর্থতাও তোমার ব্যর্থ নয়। তখন দেখ্‌বে এ জীবন শ্রেয় বলে' তা বড় নয়—এ জীবন প্রেয় বলে' তা অমৃতময়। তখন বুঝ্‌বে আমরা অধম নই, আমরা অক্ষম নই। জীবনকে গতি দাও সেই গতির স্রোতে মিথ্যার সকল আবর্জ্জনা ভেসে গিয়ে সত্য নিজের পথ করে' নেবে। সাহস করে' জীবনকে মুক্তি দাও—জীবনকে ছাড়, দেখ্‌বে অমৃত

তোমার করতলগত। তখন দেখ্‌বে আমরা অধম লোক নই—বাস্তবিকই আমরা অমৃতস্য পুত্রাঃ।

২

অভিমান ও অহঙ্কার এই দুয়ের অসৎ সঙ্গ ও দুর্ব্বলতাকে বর্জ্জন করে' আজ যেন এই সত্য কথাটা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত না হই যে আজকার আমরা জাতি হিসেবে আধ্যাত্মিক নই। আমাদের আধ্যাত্মিকতা আমাদের জীবনদেবতার মন্দিরে সহস্র দীপের শিখায় শিখায় গড়ে' ওঠে নি—আমাদের আজকার আধ্যাত্মিকতা হচ্ছে আমাদের মুখের কথা, যা আমরা মুখস্ত করেছি সংস্কৃত পুথি থেকে। পরের কথা মুখস্ত করে' আমরা মনে করেছি যে আমাদের ভিতরটাও ঠিক সেই ভাবেই গড়ে' উঠেছে। পরের কথা মুখে আওড়ালেই যদি জীবনে তা সত্য হ'য়ে ওঠে তবে সবার চাইতে পরম বৈষ্ণব হচ্ছে আমাদের টিয়েপাখীটা, যেটা রাধাকৃষ্ণ নাম ছাড়া আর কিছুই ডাকতে জানে না।

আমাদের আজ এই আধ্যাত্মিকতা নেই বলে' আধ্যাত্মিক দৃষ্টি নেই বলে' আমরা চর্ম্মচক্ষু দিয়ে মানুষের বাহিরটাই দেখেছি—তা'র সাড়ে তিন হাত লম্বা দেহটা দেখে আমরা মনে করে' নিয়েছি যে সে অধম। কিন্তু যদি আমাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি থাক্‌ত যদি আমরা এই জড় চোখ্‌ নিয়ে মানুষের জড় দেহ দেখে মানুষের বিচার কর্‌তে না বস্‌তেম তবে স্পষ্ট দেখ্‌তে পেতেম যে মানুষ অধম নয়—মানুষ মহৎ। তা'র এই সাড়ে তিন হাত দেহ নিয়েই সে মহৎ—

আর সে মহৎ ঐ অকূল জলধির চাইতে, ঐ অভ্রচুম্বিত পর্ব্বতমালার চাইতে, ঐ অনন্ত আকাশের চাইতে। কারণ ঐ জলধি পর্ব্বত আকাশ আয়তনে যতই বৃহৎ হোক্ না কেন সে সবের মধ্যে এমন একটা জিনিষ নাই যা সাড়ে তিন হাত দেহায়তন মানুষের মধ্যে আছে—সেটা হচ্ছে চৈতন্যময় পুরুষ—যে-চৈতন্যময় পুরুষ চৈতন্য-ময় ব্রহ্মের সঙ্গে স্বরূপতঃ এক। মানুষ মহৎ—ঐ জলধি পর্ব্বত আকাশের চাইতে বৃহৎ, কারণ জলধি পর্ব্বত আকাশ তাদের নিজেকে জানে না কোনদিন নিজেকে জান্‌বেও না কিন্তু মানুষ তা'র আপনাকে জানে। মানুষ আছে এবং সেই সঙ্গে সে জানে যে সে আছে। মানুষের এই জানার দিকটা আছে বলে' তা'র মধ্যে এই চৈতন্যময় পুরুষ জাগ্রত বলে' তা'র সত্তর বছরের পরমায়ু হিমাদ্রির সত্তর লক্ষ বছরের পরমায়ুর চাইতে বেশী অবিনশ্বর। হিমাদ্রির সত্তর লক্ষ বছরের জীবন মায়া হ'তে পারে কিন্তু মানুষের সত্তর বছরের জীবন মায়া নয়। কারণ এই সত্তর বছরের প্রত্যেক নিমেষটিতে সে আপনাকে জেনেছে—আর সেই জানাকে সে পেয়েছে দুঃখের ভিতর দিয়ে নয়, কষ্টের ভিতর দিয়ে নয়—পেয়েছে সে তা আনন্দ-রাগিণীর ভিতর দিয়ে—সুতরাং প্রেমের ভিতর দিয়ে।

মানুষ মহৎ—এ অহঙ্কারের কথা নয়—কারণ এটা সত্যি কথা। তবে যদি কেউ এই সত্য কথা নিয়ে অহঙ্কার করেন তবে আমরা এই বলে সান্ত্বনা পেতে পারি যে মিথ্যা কথা নিয়ে অহঙ্কার করার চাইতে সত্য কথা নিয়ে অহঙ্কার করাটা বহুগুণে ভাল।

কেননা মিথ্যা কথার অহঙ্কারে কিছুই সত্য নেই কিন্তু সত্য কথা নিয়ে অহঙ্কার করার মধ্যে অন্ততঃ অর্দ্ধেক সত্য আছে।

মানুষ মহৎ। সুতরাং আমি অধম নই—আমি মহৎ। কিন্তু মহৎ আমি শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক বলে' নয়—কিম্বা আমি মহামহিম শ্রীল "এডুকেশন গেজেটের" পত্রপ্রেরক বলে' নয়—আমি মহৎ কারণ আমার মধ্যে ভগবানের পূর্ণতম স্পর্শ রয়েছে।

ভগবানের এই পূর্ণতম স্পর্শ যে-মুহূর্ত্তে মানুষ অস্বীকার করছে সেই মুহূর্ত্তে সে আপনাকে ছোট করে' জান্‌ছে, দুঃখী করে' জান্‌ছে, দীনহীন অধম করে' জান্‌ছে। কারণ তখন সে আপনাকে মিথ্যা করে' মান্‌ছে। আর মিথ্যার খিড়্‌কীর দ্বার দিয়ে যা একদিন চুপে চুপে প্রবেশ করে, তাই যখন আর একদিন সগর্ব্বে আমাদের সিংহদ্বারে এসে মাথা উঁচু করে' দাঁড়িয়ে সজোরে আপনার বাজনা বাজায় তখন আমরা তা'কে সাত সেলাম ঠুকে সত্যের আসনখানি বিনীতভাবে ছেড়ে দিয়ে তা'রই পূজোয় বসে' যাই। ফলে কিছুদিনের মধ্যে হ'য়ে উঠি "আমরা অধম লোক"।

"সবুজ পত্র" সম্পাদক মহাশয় একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন যে উদ্ভিদ পশু ও মানুষের তিনটি বিশেষ পৃথক ধর্ম্ম আছে। উদ্ভিদের স্থিতি, পশুর গতি আর মানুষের মতি। এই মতিকেই আমরা যৌগিক ভাষায় বলি ইচ্ছাশক্তি—ইংরাজিতে বলে' থাকি will—will to be. আসলে পুরুষের এই ইচ্ছাশক্তি যখন মানুষের মনোজগতে তা'র ইচ্ছার ছায়া ফেলে তখনই আমরা তা'কে বলি

মতি। মানুষের আশা আকাঙ্খা কামনা বাসনা চেষ্টা প্রয়াস সবই হচ্ছে তা'র সেই অতি অন্তরতম ইচ্ছাশক্তিরই এক একটা অপরা বা বিকৃত রূপ।

এখন মানুষের এই মতি বা ইচ্ছাশক্তি আছে বলে' মানুষের সম্বন্ধে এমন একটা মজা আছে যা উদ্ভিদ বা পশুর নেই। এই মজাটা হচ্ছে যে তা'র কোন বন্ধন নেই। উদ্ভিদের বা পশুর যে প্রকৃতিদত্ত বন্ধন আছে মানুষের তা নেই—কারণ মানুষের মধ্যে যে প্রকৃতি সে-প্রকৃতি মানুষের মধ্যে যে পুরুষ আছেন সেই পুরুষের অধীন। মানুষের মধ্যের এই পুরুষ হচ্ছেন জাগ্রত দেবতা। এই জাগ্রত দেবতারই সেবা করছে প্রকৃতি—যেন লক্ষ্মীরূপে বিষ্ণুর, যেন পার্ব্বতীরূপে শিবের, যেন সরস্বতীরূপে ব্রহ্মার।

এই যে পুরুষের ইচ্ছাশক্তি—তার will—will to be—এই সত্যকে যখন আমরা দেখতে চাইনে তখনই আমরা মনে করি যে "আমরা অধম লোক।" তখন "সোহহম্" তত্ত্বমসি কথাগুলো পাগলের প্রলাপের মত মনে হয়। তখন আমরা বুঝতে পারিনে যে এটা নেহাৎ বাজে কথা নয় যে God made man in His own image.

এখন মানুষের যে চিন্তা সে চিন্তাও হচ্ছে তা'র এই ইচ্ছাশক্তিরই একটা রূপ। আমরা ইংরাজীতে বলি thought-power. এই thought-powerএর জন্ম হচ্ছে আসলে will-powerএ। জগতে যা কিছু ঘটছে—যা কিছু পরিবর্ত্তন, সংঘর্ষ, সংগ্রাম, শান্তি যা কিছু তা চালিত হচ্ছে এই thought-power দিয়ে। স্বপ্ন-

জগতে বা মনোজগতে যে চিন্তার তরঙ্গ প্রবাহিত হচ্ছে সেই চিন্তা-তরঙ্গই অনুবাদিত হচ্ছে স্থূলজগতে বা জড়জগতে কর্ম্মরূপে—মানুষের নানা অনুষ্ঠানরূপে—নানা প্রয়াসরূপে।

কিন্তু মানুষের চিন্তার ধারা যে কেবল তা'র বাহিরের জগতের জীবনপ্রাণালী বা কর্ম্মপ্রণালীই নিয়ন্ত্রিত কর্‌ছে তাই নয়—প্রত্যেক মানুষের চিন্তা তা'র আপনার জীবনকেও গঠিত করে' তুল্‌ছে, কারণ আগেই বলেছি যে মানুষের চিন্তাটা আর কিছুই নয়—সেটা তা'র ইচ্ছাশক্তিরই একটা রূপ—ইচ্ছাশক্তিরই একটা তরঙ্গ—vibration. এইজন্যে মানুষ অবিরাম যা চিন্তা করে সে তাই হয়। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। গীতায় ভগবানও বল্‌ছেন যে—আমাকে যে যে-ভাবে কামনা করে আমি তা'কে সেইরূপ ফলই প্রদান করি। এ সকলের ভিতরের কথা-টাই হচ্ছে ঐ যে আমাদের চিন্তার ভিতর দিয়ে বাস্তবিক পক্ষে আমাদের ইচ্ছাশক্তিই আপনাকে প্রকাশ কর্‌তে থাকে। সেই জন্যে আমরা আজ কি চিন্তা কর্‌ব এ বিষয়ে আমাদের খুব সাবধান হ'তে হবে। আমাদের জাতিটা যদি দিনরাত এই চিন্তা কর্‌তে থাকে যে "আমরা অধম লোক" তবে তা'র আর কোনদিনই উত্তম হবার সম্ভাবনা থাকবে না—এ-কথাটা এক কলমে লিখে দেওয়া যেতে পারে।

মানুষের এই যে মনের দীনতা-ভাব তা আমাদের মধ্যে অনে-কেই ছাড়তে চান না তা'র কারণ হচ্ছে যে এই দীনতা-ভাবে মানুষের একটা তামসিক আনন্দ আছে। যদি বল যে তামসিক

আনন্দ পদার্থ টা আবার কি? তা'র উত্তরে উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যেমন গুলিখোরের বা আফিমখোরের নেশার আনন্দ সেই হচ্ছে তামসিক আনন্দ।

কিন্তু আজ আমরা এই দীনতার যুগ তামসিকতার যুগ কাটিয়ে উঠ্‌ছি। "হরি দিন ত গেল সন্ধ্যা হ'ল পার কর আমারে" আমাদের আর আনন্দ দিতে পার্‌ছে না। কবি কণ্ঠের "তরিতে পারি শকতি যেন রয়" আজ আমাদের মন হরণ করেছে। তাই আজ আমরা প্রার্থনা করি যেন সমগ্র বাংলা দাঁড়িয়ে উঠে আজ এই কথা বল্‌তে পারে—সজ্ঞানে বল্‌তে পারে—

"এস প্রভু, তুমি দীনের প্রভু নও। আমাদের মধ্যে যে অদীন, যে অমর, যে প্রভু, যে ঈশ্বর আছে, হে মহেশ্বর, তুমি তাহারই প্রভু—ডাক আজ তাহাকে তোমার নিজ সিংহাসনের দক্ষিণপার্শ্বে। দীন লজ্জিত হউক, দাস লাঞ্ছিত হউক, মূঢ় তিরস্কৃত হইয়া চিরনির্ব্বাসন গ্রহণ করুক!"

সমাপ্ত

বিজ্ঞাপন

প্রবন্ধগুলি পূর্ব্বে প্রবর্ত্তকে বাহির হইয়াছিল—এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক মনে করি। ইতি—

প্রকাশক

১লা আশ্বিন, ১৩২৬
চন্দননগর

আমাদের প্রকাশিত বই